দ সিরিজ—

মার্ক টোয়েন

● শ্রীমধুসূদন মজুমদার ●

সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মে
১৯৬৪

ছেপেছেন—
এস্, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

প্রণীত

বটল ইম্প

যেও না চলে

মাইকেল স্ট্রগফ

বটকালীর জঙ্গলে

সে ডাকে আমায়

যবনিকার অন্তরালে

মা! আমি অশোক

জনসেবক বিধানচন্দ্র

মরণদূতের আনাগোনা

● অনুবাদ সিরিজ—

মার্ক টোয়েন

'দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার' বইটির রচয়িতা হলেন অবিনশ্বর লেখক মার্ক টোয়েন। এঁর আসল নাম হল স্যামুয়েল ল্যাংগহর্ন ক্লিমেন্স। ছেলেবয়সে আমেরিকার মিসিসিপি নদীতে তিনি প্রায়ই নৌকা করে বেড়িয়ে বেড়াতেন। চলন্ত নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে পথনির্দেশক নাবিক দড়ি ফেলে নদীর গভীরতা মাপতে মাপতে যেত। দড়িটি নদীর নীচে মাটিতে ঠেকলেই নাবিক চেঁচিয়ে উঠত "মার্ক টোয়েন"। কথাটি স্যামুয়েলের মনে লাগে। তাই তিনি যখন বই লিখতে শুরু করেন, বইতে লেখকের স্থানে নিজের নামের বদলে

মার্ক টোয়েন কথাটি ব্যবহার করতে থাকেন। ফলে আজ স্যামুয়েলের আসল নামে খুব কম লোকই তাঁকে চিনতে পারেন, কিন্তু মার্ক টোয়েন বললে কারো চিনতে বাকী থাকে না।

১৮৩৫ সালে নভেম্বর মাসে মার্ক টোয়েন জন্মগ্রহণ করেন মিসুরী প্রদেশের ফ্লোরিডা অঞ্চলে।

এ প্রদেশ আমেরিকার অন্তর্গত।

ছেলেবয়সে পিতৃহীন হওয়ার ফলে মার্ক টোয়েনকে বাধ্য হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে উপার্জনের জন্যে কোন এক মুদ্রাকরের কাছে কাজ নিতে হয়।

কিছুকাল এই কাজ করার পর একাজে তাঁর মন লাগে না। সদাই নদীতে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে হতে থাকে। ক্রমশঃ ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠার পর ক্লিমেন্স গিয়ে নদীতে বাষ্পীয় পোতের চালকের কাজ নিলেন। এইভাবে ঘুরে বেড়াবার ফলে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হতে থাকে। এই সব অভিজ্ঞতা তাঁর গুটিকতক নামকরা বইতে কাজে লাগে। দি অ্যাড্ভেঞ্চারস্ অব হাক্ল্বারী ফিন, দি অ্যাড্ভেঞ্চার অব টম্ সইয়ার, লাইফ অফ্ দি মিসি-সিপি, এই সব বিখ্যাত বইগুলি পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় লিখেছিলেন।

এরপর আমেরিকায় রেলগাড়ির প্রচলন হয়। লোকে নদীপথে চলাচল করা কমিয়ে দিলে। যাত্রীর অভাবে নদীপথে স্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে এল। বাধ্য হয়ে মার্ক টোয়েনকে উপার্জনের জন্যে অন্যদিকে মন দিতে হল।

আমেরিকায় যখন সিভিল ওয়ার শুরু হল, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মার্ক টোয়েন দক্ষিণী-সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্যে নাম লেখাতে গেলেন।

যাবার পথে কোন এক সৈনিককে শত্রুপক্ষের দলভুক্ত ভেবে তাঁরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেললেন।

হঠাৎ একটা জলজ্যান্ত মানুষকে এইরকম চোখের সামনে বীভৎসভাবে নিহত হতে দেখে মার্ক টোয়েন ভয়ে আঁতকে উঠে বন্ধুদের ছেড়ে পশ্চিমদিকে পালিয়ে নেভাদা অঞ্চলে এসে দিনকতক কোন সংবাদপত্রের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তারপর একজন লোকের সঙ্গে পার্টনারশিপে সোনা খুঁজতে শুরু করেন।

একটা ভাল স্বর্ণ-ক্ষেত্রের খোঁজও পেয়েছিলেন।

নেহাত আলস্যবশে জমি রেজেস্ট্রি করে দখল নিতে দেরি করার ফলে কোন এক উৎসাহী স্বর্ণান্বেষণকারী সেটা দখলে নিয়ে নেয়। তা যদি না

নিত আমরা কখনও মার্ক টোয়েনের নাম শুনতে পেতুম না। সে যাহোক, স্বর্ণখনিকে পটভূমিকা করে মার্ক টোয়েনের আর একটি বিখ্যাত বই বেরিয়েছিল। বইটির নাম "জাম্পিং ফ্রগ অব্ ক্যাডাভেরাস্ কাণ্ট্রি"। কিন্তু "ইনোসেণ্টস্ অ্যাব্রড্" বইটি লেখার পর তিনি পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে পড়েন।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়েই ক্লিমেন্স মনোনিবেশ করে দেখতেন। ফলে সব বিষয়ের উপর তাঁর লেখা আসত। একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলে বোঝা যাবে তিনি কত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গল্প লিখতে পারতেন। এসব বইগুলি হল, "এ ট্র্যাম্প অ্যাব্রড্", "কানেকটিকাট্ ইয়াংকি ইন্ কিং আর্থারস কোর্ট", "পাডনহেড্ উইলসন", "দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার"।

শুধু গল্পের মাধুর্য নয় তাঁর লেখার ভাষাও ছিল খুব চিত্তাকর্ষক। পৃথিবীর সব দেশের লোকেরা আজও তাঁর লেখা বই পড়ে খুব আনন্দ পায়।

২১শে এপ্রিল ১৯১০ সালে এই শক্তিশালী লেখকের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর আগে অবধি তাঁর রহস্যপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর এই রহস্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটা গল্প খুব চালু আছে।

সেবার তিনি গুরুতর পীড়ায় মরণাপন্ন। আত্মীয় বন্ধু সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এই সময় কোন এক উৎসাহী সংবাদপত্র বাহবা নেবার মতলবে প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্রের আগেই মার্ক টোয়েনের মৃত্যু-সংবাদ ছাপিয়ে দেয়।

সংবাদটা মার্ক টোয়েনের কানে আসতে তিনি তৎক্ষণাৎ সংবাদ পরিবেশন কেন্দ্র এসোসিয়েটেড প্রেসকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেন যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর মৃত্যু-সংবাদ খুব অতিরঞ্জিত করা হয়েছে।

নিজের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে রহস্য করা একমাত্র এই ধরনের রসিক লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই রকম অশেষ গুণের জন্যে মার্ক টোয়েনের স্মৃতি আজও সকলের কাছে অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রকাশক

রাজপুত্র এটা যখন বর্মের ভেতর লুকিয়ে রাখেন—

দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার

১

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ। হেমন্ত ঋতুর এক সুপ্রভাতে লণ্ডন নগরে এক শিশুর জন্ম হল, নাম তার টম ক্যান্টি। গরিব ক্যান্টি পরিবার এ ছেলে চায় নি, খাদ্য যেখানে নেই, সেখানে খাওয়ার মুখ বাড়াতে কে চায়?

ঠিক ওই দিনেই আর একটি ছেলেও জন্মাল—লণ্ডনের এক অতি ধনীর গৃহে, যেমন ধনী তেমনি ক্ষমতাবান, এক কথায় টিউডর বংশ—ইংলণ্ডের রাজপরিবার। টিউডরেরা এ ছেলে একান্ত ভাবেই চেয়েছিল, আর শুধু টিউডরেরা কেন, চেয়েছিল সারা ইংলণ্ডই। এমন আকুল ভাবে প্রার্থনা করেছিল একটি রাজবংশধরের জন্য যে তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইংরেজ জাতটাই যেন আনন্দে উন্মাদ হয়ে গেল। ছুটি! ছুটি। কাজ ফেলে পথে বেরিয়ে এল নারী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ। কেবল ভোজ! কেবল নাচ আর গান। সামান্য-পরিচিত লোক পথে দেখলে পরমাত্মীয়ের মত তাকে সস্নেহে আলিঙ্গন। এ উন্মাদনা একদিনে শেষ হল না, সমানে চলল দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। দিনে সমারোহের শেষ নেই, প্রতি অলিন্দে প্রতি ছাদে রঙীন পতাকা উড়ছে, প্রতি রাজপথে চলেছে নানা রঙের পোশাক পরা নাগরিকদের বর্ণোজ্জ্বল মিছিল। রাত্রির সমারোহ আরও বেশী, প্রতি মোড়ে বিশাল বিশাল অগ্নিকুণ্ড, আর তাই ঘিরে ঘিরে নৃত্যপাগল নরনারীর সংযমহীন মাতামাতি।

সারা ইংলণ্ডে আর কোন কথা নেই—এডওয়ার্ড টিউডর প্রিন্স অব ওয়েলস-এর কথা ছাড়া। রেশমে সাটিনে আপাদমস্তক-ঢাকা রাজপুত্র কিন্তু এত সব মাতামাতির কোন খবর রাখে না, এত যে মহান লর্ড আর মহীয়সী লেডিরা তার পরিচর্যার জন্য সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে আছে, তাদের সম্বন্ধেও সে একেবারেই উদাসীন। পরিচর্যা? করুক না! তাই করতেই ত আছে ওরা!

কিন্তু টম ক্যান্টি? তার সম্বন্ধে কোথাও কোন উচ্চবাচ্য নেই, সেই একটিমাত্র নিঃস্ব পরিবারে ছাড়া, যাদের অতি-অল্প কালো রুটির ভাগীদার হওয়ার জন্যই অভাগার ধরায় আগমন।

* *

কয়েকটা বৎসর পেরিয়ে যাওয়া যাক।

লণ্ডনের বয়স তখন দেড়হাজার বছর। তখনকার দিনের হিসাবে বড় শহরই। লাখ খানেক লোক সেখানে বাস করে, কেউ-বা বলে আরও বেশী। পথঘাট সরু সরু, আঁকা বাঁকা, নোংরা। টম ক্যান্টির বাস যে অঞ্চলে, লণ্ডন ব্রিজের অতি নিকটেই, সেখানটা আবার অতি-কদর্য, নোংরার চূড়ান্ত একেবারে।

বাড়িগুলো সেখানে কাঠের। একতলার চাইতে দোতলা বেশী চওড়া, মানে দুইদিকে বেরিয়ে আছে কয়েক ফুট করে। আবার দোতলার চাইতে তেতলা আরও চওড়া। বাড়ি যত উঁচু হচ্ছে, পাশও বাড়ছে সেই অনুপাতে। প্রতি তলার বাড়তি অংশটার নীচে মোটা মোটা কাঠের কাড়। তাতে লাল, নীল বা কালো রং মাখানো। সবে মিলে একটা চটকদার চেহারা। জানালাগুলি ছোট ছোট, তাতে রুহিতনের আকারের কাঁচ, কবজায় ঝোলানো এসব জানালা বাইরের দিকেই খোলে, ঠিক দরজার মত।

পুডিং লেন থেকে ওফাল কোর্ট—আঁস্তাকুড় বস্তি। টম ক্যান্টির বাবা এইখানে থাকে। ছোট, ভাঙা, নড়বড়ে বাড়ি—কামরায় কামরায় গিজগিজ করছে মানুষ। দারিদ্র্যের শেষ সীমার মানুষ এরা।

ক্যান্টি-গোষ্ঠী থাকে চারতলার এক ঘরে। এক কোণে খাট-জাতীয় একটা বস্তু রয়েছে, সেটা ক্যান্টি-কর্তার নিজস্ব শোবার জায়গা। পরিবারের অন্য সবাই—টম, তার দুই দিদি ন্যান আর বেট, টমের মা আর ঠাকুরমা—তাদের জন্য রয়েছে অঢেল মেঝে, যেখানে খুশি গড়িয়ে পড় আর ঘুমিয়ে যাও। দুই একটা ছেঁড়া কম্বলের টুকরো আর কয়েক আঁটি পুরোনো খড়—এই হল তাদের শয্যাদ্রব্য। সকালে সব একসাথে গুটিয়ে এক কোণে ঠেলে রাখা হয়, রাত্রে যে যেটা পারে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

টমের দুই দিদি—বেট আর ন্যান, দুই যমজ বোন। বয়স তাদের পনেরো। তাদের অন্তঃকরণটা ভাল, বাইরেটা একান্ত নোংরা। ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে, দুনিয়ার কোন কিছুর খবর রাখে না। তাদের মা-ও তাদেরই মত।

কিন্তু টমের বাবা? আর ঠাকুরমা?—বাপ্! দুজনে দুটি দানব-দানবী যেন। সুযোগ পেলেই তারা মদ খায় এবং মাতাল হয়। সে সময় যাকে সমুখে পায় তাকেই মারে। পরস্পরকে মারতেও ছাড়ে না। মাতাল হোক বা সজ্ঞানে থাক, মুখে তাদের অশ্রাব্য গালিগালাজ আর বাপান্ত-শাপান্ত ছাড়া কথা নেই। জন ক্যান্টি হল চোর, আর তার মা হল ভিখিরী।

ছেলেমেয়েগুলোকেও তারা ভিখিরী তৈরি করেছে, চোর তৈরি করার চেষ্টাও করেছিল বই কি, সেটা পেরে ওঠে নি।

গোটা বাড়িটা হরেক রকম মানুষে ভরতি। এমনও একজন তাদের ভেতরে আছে—যে তাদের ভেতরে থেকেও তাদের থেকে অন্যরকম। লোকটি এক বৃদ্ধ পাদরী। রাজার আদেশে তাকে যাজকবৃত্তি থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছে। বাড়ি গিয়েছে, আশ্রয় গিয়েছে, সব কিছুর বিনিময়ে রাজসরকার তাকে বরাদ্দ করেছে কয়েক পেনী মাসহারা।

এই পাদরী ভদ্রলোকের কাজ ছিল—আঁস্তাকুড় বস্তির সমস্ত

ছেলেমেয়েকে একত্র করে তাদের লেখাপড়া শেখানো। গোপনে গোপনে দু'চারটা নীতিবাক্যও শোনাতেন তাদের। গোপনে, তা নইলে জন ক্যান্টি-জাতীয় অভিভাবকদের হাতে কবে মার খেয়ে মারা পড়তেন ভদ্রলোক।

এই পাদরী অ্যানড্রু টমকে কিছু লাটিন শিখিয়ে দিলেন, শেখালেন লিখতে এবং পড়তে। বেটকে আর ন্যানকেও তিনি শেখাতে চেয়েছিলেন, তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে। অমন বিদঘুটে জিনিস শিখলে তারা বস্তির অন্য মেয়েদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?

সমস্ত আঁস্তাকুড় বস্তিটাই ক্যান্টিদের বাড়ির একটা বৃহৎ সংস্করণ যেন। মাতলামি, দাঙ্গা, আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়া—এই হল সেখানকার প্রতি রাত্রির কর্মসূচী। মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে—এ দেখে যেমন আস্তাকুড় বস্তির কেউ কখনো অবাক হয় না, তেমনি অবাক হয় না কারও মাথা অন্য কেউ ভেঙে দিয়েছে দেখলে।

তবু বাচ্চা টমের দিন খুব দুঃখে কাটছে না। মানে, কাটছে দুঃখেই বটে, কিন্তু সে-দুঃখকে দুঃখ বলে সে বুঝতে পারে না। বস্তির প্রত্যেকটা ছেলে তো ওই একইভাবে দিন কাটাচ্ছে! সুতরাং ওই ভাবে দিন কাটানোই বোধ হয় সংগত এবং সুখের।

যেদিন ভিক্ষা জোটে না—ভিক্ষা করা আইনতঃ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয়—সেদিন টম জানে যে বাড়ি ঢোকামাত্র বাবা আগে তাকে শাপান্ত করবে এবং পিটিয়ে লাশ বানাবে, তারপরে শুনবে তার কৈফিয়ত। বাবা যদি না থামল, তখন শুরু করবে ঠাকুরমা, বাবার চাইতেও প্রহার বিদ্যায় পাকা হাত ওই বুড়ীর। দুই দফা গো-বেড়েন গলাধঃকরণ করে ব্যথায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে যখন ঘুমিয়ে পড়বে শেষ পর্যন্ত, সেই নিশুতিরাতে তার উপোসী মা, নিজে-না-খেয়ে-বাঁচানো এক টুকরো কালো রুটি বা ওই জাতীয় অন্য কিছু

তুচ্ছ খাদ্য নিয়ে চোরের মত চুপি চুপি তার কাছে আসবে হামা টেনে টেনে, আর তার মুখে গুঁজে দেবে ওই একটুখানি রুটি।

বোকা মা এক এক রাত্রে ধরাও পড়ে যায় ডাইনী ঠাকুরমার হাতে, আর সে-রাত্রে জন ক্যান্টি উঠে দরাজ হাতে উত্তমমধ্যম দেয় তার অবাধ্য পত্নীকে।

তবু টমের জীবন মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই কাটে। বিশেষ করে গরমের দিনে। বাপের দৈনিক দাবি পূরণ করবার জন্য যেটুকু ভিক্ষা না করলেই নয়, সেইটুকুই সে করে। তার পরে খাঁটি হয়ে গিয়ে বসে পাদরী অ্যানড্রুর ঘরে, গল্প শোনবার জন্য। কী মজাদার সব গল্প বলেন অ্যানড্রু। দত্যিদানো, পরী-পিশাচ, বামন-জাদুকর, রাজা-রাজপুত্র— কী নয়?

গল্প শুনে শুনে টমের মাথা বিগড়ে যাওয়ার মতই হল বোধ হয়। ওই সব অত্যাশ্চর্য গল্প কথা ছাড়া অন্য কিছু তাব মগজে ঠাঁই পায় না কোন সময়। রাত্রে হয়ত খেতে পায় নি, উপরন্তু মারধোর হয়ত প্রচুর পরিমাণেই খেতে হয়েছে, অন্ধকারে কয়েকগাছি দুর্গন্ধ খড়ের উপর গড়াতে গড়াতে দু'চোখে ঘুম আর তার আসে না। কী ভাবে সে? ভাবে সেই সব গল্পের কথা, যা সারাদিন সে শুনে এসেছে পাদরী অ্যানড্রুর মুখ থেকে। সম্রাট্ চলেছেন লক্ষ সৈন্যের পুরোভাগে, পতপত করে উড়ছে বিজয় পতাকা, আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তূরীভেরী জয়ঢক্কার নিনাদে, মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠছে লক্ষ ভক্ত-প্রজার কণ্ঠ থেকে। স্বর্ণমাণিক্যে ঝলমল রাজপ্রাসাদে সিংহাসন আলো করে বসেছেন রাজা, দীর্ঘোন্নত সেনানীগণ অসি-ঝনঝনায় মুখর করে তুলেছে দরবার কক্ষ, রাজপুত্র রাজকন্যারা রেশমে-ভেলভেটে হীরায়-মুক্তায় প্রজাপতির মত সেজে ভ্রমণ করছেন উদ্যানে উদ্যানে— কল্পনার এই সমারোহ বিনিদ্র নয়নের সম্মুখে জীবন্ত হয়েই যেন ফুটে ওঠে তার।

শুধু ফুটে ওঠা? কল্পনার সমারোহ যেন বাস্তব রূপ ধারণ করে

টম ক্যান্টিকে তাদের অঙ্গীভূত করে নেয়। টম ক্যান্টিও যেন রাজ-পোশাকে সেজে রাজপুত্রদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় এদিকে ওদিকে ঘোরে ফেরে, বিনয়াবনত লর্ডদের সঙ্গে রাজকীয় গাম্ভীর্যে মণ্ডিত অলংকারবহুল ভাষায় কথা বলে, চোখের কোণে কখনও ফুটিয়ে তোলে প্রসন্ন হাসি, কখনও বা ভয়াল ভ্রূকুটি, যা দেখে কল্পিত লর্ড-লেডিরা কম্পমান কলেবরে পিছনে সরে এসে নিভৃত বিবরে লুকিয়ে পড়ে।

টম শুধু পাদরী অ্যান্ড্রুর গল্পই শোনে নি, বইগুলিও পড়েছে। সে সবই সেই পুরোনো আমলের রাজাগজার কাহিনী নিয়ে লেখা। রাজাগজাদের চলার ভঙ্গী, বলার ভণিতা, সব তাতে সবিস্তারে বর্ণনা করা আছে। গোগ্রাসে গিলে সে সব মুখস্থ করেছে টম ক্যান্টি, এবং মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হয় নি, আঁস্তাকুড় বস্তির বন্ধুদের সঙ্গে আলাপের সময় সে ভঙ্গী এবং সে-ভাষা নিঃসংকোচেই টম ব্যবহার করে। বন্ধুরা অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকত প্রথম প্রথম, এখন তারা হাসে। হাসে এবং পাগল বলে খ্যাপায় টম ক্যান্টিকে।

সারা বস্তিতে রটনা হয়ে গেল—পাদরীর বইয়ে রাজার গল্প পড়ে পড়ে টম ক্যান্টি নিজেও রাজা বনে গিয়েছে, বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে ছেলেটা, কবে তাকে বেঁধে রাখতে হয়—দেখ।

রটনাটা শুনেছে তার বাবাও। রেগে সে আগুন হয়ে গিয়েছে। প্রহারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে মারত শুধু খালি হাতে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরলে। আজকাল উঠতে বসতে মারে, কারণে অকারণে। অমনোযোগী দেখলে মার, হাসিমুখ দেখলে মার, গম্ভীর মুখ দেখলে মার। টম যেভাবেই যেখানে থাকুক, শুয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে, জন ক্যান্টির কেবলই সন্দেহ হয়—ছেলেটা রাজাগিরির মহলা দিচ্ছে মনে মনে।

সত্যিকথা বলতে কি, জন ক্যান্টির সন্দেহ সব সময়ে মিথ্যে হয় না। রাজাগিরির মহলা টম দেয়; হাতের নাগালে সমবয়সী সঙ্গীদের

পেলে তা তাদেরই উপলক্ষ করে ও-কাজ করা চলে, কাউকে না পেলেও আটকায় না, তখন দরজা জানালা লাঠিসোটাকেই আশ্রিত অনুচর বলে কল্পনা করে নিতে হয়।

কল্পনা যতক্ষণ অব্যাহত চলতে থাকে, ততক্ষণ টম আনন্দের সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করছে। সে-স্বর্গ থেকে বিদায়ও নিতে হয় দ্রুত এবং আকস্মিক ভাবে। বাবা কখন পিছন দিক দিয়ে এসে পিঠে চাবুক কষে দিয়েছে হয়ত, ছুটে পালায় টম, বিলাপে, অশ্রুজলে। চোখ মুছতে মুছতে ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়ে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে।

* * *

সেদিন সকাল বেলাতেই টমের কান ধরে টেনে তুলে দিল জন ক্যান্টি। "হতভাগার রাত আর ভোর হয় না। ওহে বাদশাজাদা, আজ ঘরভাড়া দুই পেনী দিতে হবে বাড়িওয়ালাকে। ওটার ভার তোমার উপর রইল। বাড়ি ফেরার সময় তোমার রাজভাণ্ডার থেকে দুটি পেনী নিয়ে আসতে যেন ভুল না হয়। ভুল হলে কি হবে, তা বুঝতেই পারছ!"

ভুল হলে কি যে হবে, সে সম্বন্ধে যাতে তিলমাত্র সন্দেহ টমের মনে না থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় অগ্রিম নমুনা স্বরূপ দুটো কিল এবং একটা লাথি মেরে জন ক্যান্টি তার বংশধরকে রাস্তায় বার করে দিল। টম বেরিয়ে পড়ল দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে সুখস্বপ্ন দেখার পর শেষ রাতের দিকে সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের ভিতরও জের চলেছে সেই সুখস্বপ্নের। টম যেন রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে প্রকাণ্ড একটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বিশাল এক রাজপ্রাসাদের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কটি থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে তারই বাঁট দিয়ে সে সশব্দে আঘাত করল লৌহতোরণে। অমনি ভিতর থেকে খুলে গেল দ্বার, বর্মাবৃত প্রহরীরা তরোয়াল খুলে ললাটে স্পর্শ করল

অভিবাদন জানাবার জন্য। সুস্বরে ঐকতান বাদন বেজে উঠল কোথায়—'জয়তু যুবরাজ', 'জয়তু যুদ্ধজয়ী বীর' স্বাগত-সম্ভাষণে পূর্ণ হল প্রাসাদচত্বর—

তারপরই মাথার চুলে কর্কশ আকর্ষণ—জন ক্যান্টির কর্কশ স্বরে বিদ্রূপবর্ষণ—নিত্যকার বরাদ্দমত প্রহার—কম্পমান টমের দ্রুতপদে পলায়ন।

দ্রুতপদে সে পেরিয়ে গেল আঁস্তাকুড় বস্তি, চেনা পথ দ্রুতপদে অতিক্রম করে দূরে দূরান্তরে সে গিয়ে পড়ল অচেনা পল্লীতে। ক্ষুধায় উদর জ্বলে যাচ্ছে - কাল রাত্রে আর খাবার জোটে নি কিছু। থেকে থেকে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে যেন। কোমরের দড়িটা আরোও আঁটো করে সে বাঁধে তখন। তারপর আরও এগিয়ে যায়, আরও, আরও। এখন বেলা আটটার বেশী নয়। অনেক—অনেক দূর চলে যাওয়ার সময় আছে। বাড়ি ফেরা? সে চিন্তা তখন সন্ধ্যা নাগাদ করা যাবে। এদিকটায় আসা হয় নি কোনদিন। ভাল করে দেখে নেওয়া যাক।

চেরিং গ্রাম। লোকালয় বিরল। বিরাট এক ক্রশ খাড়া হয়ে লোকের মনে ধর্মভাব জাগাবার চেষ্টা করছে। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব কোন নরপতি মৃতা পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশে এই ক্রশ গড়িয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। টম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ধর্মভাব কেন, কোন ভাবই তার মনে জাগল না। যে কল্পনারাজ্যের সে বাসিন্দা, নিদ্রায় ও জাগরণে, সেখানে এ বস্তু সে কোনদিন দেখে নি।

আরও এগিয়ে চলে টম। জমকালো এক প্রাসাদ। কার্ডিনল উল্‌জীর প্রাসাদ। এখন রাজার অধিকারে। রাজা এখানে বাস করেন না, কারণ তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ আছে এর চেয়েও বড়, এর চেয়েও জমকালো। নাম তার ওয়েস্টমিনিস্টার। সে আরও দূরে।

স্ট্রাণ্ড এইবারে। একধারে ঘন বসতি, অন্যধারে বসতি খুব কম, মাঝে মাঝে বড় বড় জমিদারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, বহু-বিস্তীর্ণ

হাতায় ফুল আর ফলের বাগান। ওপাশ দিয়ে টেমস নদীর ঘোলা জলের স্রোত। ঘিঞ্জি বস্তির অধিবাসী টম ক্যান্টির মনে হল সে বুঝি স্বর্গের রাজপথে বিচরণ করছে।

হঠাৎ, ও কি? এই মস্তবড আকাশ-ছোঁযা বাড়িটা কার? বাড়ি আর রাজপথের ভিতরে কী বিস্তীর্ণ চত্বর! কোথাও মখমলের মত কোমল ঘাসের আস্তরণ, কোথাও পাথর দিয়ে গাঁথা সাদা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ভেতর সৈনিকদের কুচ্‌কাওয়াজ। ঘাসের ওপরে সুবেশ লর্ডদের বর্ণোজ্জ্বল সমাবেশ।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ যেন একটুকরো স্বর্গ সমুখে দেখতে পেল টম, থেমে গেল তখুনি। থেমে শুধু একা সে যায় নি। থেমে রয়েছে শত শত মানুষ, রাস্তার ধারে, রাস্তার ওপরে, কিন্তু প্রাসাদের রেলিং দেওয়া বেষ্টনী থেকে বেশ খানিকটা দূরে। উঁচু লোহার রেলিং, মাথায় তার সোনার গিলটি। মাঝে মাঝে বড বড় তোরণ-পথ। প্রধান তোরণ লাল পাথরের তৈরী, তার দুই পাশে দুটি বর্মাবৃত মূর্তি। মূর্তি অবশ্য জীবন্ত, যদিও জীবনের চাঞ্চল্য তাদের ভেতরে একেবারেই অনুপস্থিত। দুটি সশস্ত্র প্রহরী প্রস্তরমূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দণ্ডায়মান।

টম তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে শতেক দরিদ্র এই রাজৈশ্বর্যের সমারোহের পানে সতৃষ্ণ নয়নে। নিজেদের উদরে ক্ষুধার জ্বালা, কিন্তু তাও বিস্মৃত হয়ে তারা রাজপরিবারের এই বিলাসসম্ভারের পানে তাকিয়ে আছে, উপভোগের আনন্দ নিয়ে। ও-সমারোহ, ওই প্রাচুর্য—ও যেন তাদের কিছু না হয়েও তাদেরই। রাজাও তাদের রাজা, লর্ডেরাও তাদেরই লর্ড। ওদের গৌরবে এরা স্ফীত হয়ে না উঠবে কেন?

স্ফীত না হোক, উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে টম ক্যান্টিও। তার গত রজনীর স্বপ্নের সঙ্গে অনেকটাই ত মিলে যাচ্ছে! এমনি রাজপ্রাসাদ সেও দেখেছিল, তোরণদ্বারে সেও এসে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু না, আর

মিলছে না। তার সঙ্গে সে রাজবেশ কই আজ? কটি থেকে তরোয়াল খুলে তোরণে আঘাত করবে—কটিতে নেই সে তরোয়াল, মনেও নেই সে সাহস।

বড় বড় লৌহদণ্ড পাশাপাশি বসিয়ে রেলিং তৈরী হয়েছে। তাদেরই ফাঁকের ভেতর দিয়ে প্রাসাদচত্বরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করছে টম এবং আরও শত শত দর্শক। হঠাৎ টমের সমস্ত ধমনী বেয়ে দেহের সমস্ত রক্ত যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে যাচ্ছে। ও কে? কে ও?

টমেরই বয়সী এক বালক। মাথায়ও টমেরই মত। কিন্তু কী তার বসনভূষণের জলুস! সাটিনে সিল্কে হীরায় মুক্তায় একটা জ্যোতির্ময় আবির্ভাব! কটিতে ক্ষুদ্র তরবারি, ততোধিক ক্ষুদ্র ভোজালিও একখানি মাথায় লাল রেশমের আঁটো টুপি, তার ওপর তিনটি পালক; সেই তিন পালকের শীর্ষদেশ একখানি হীরার ভেতর নিপুণভাবে গাঁথা।

ধীরে ধীরে টম এগিয়ে আসছিল ভিড়ের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে, কিন্তু এই অপরূপ সুন্দর রাজপুত্রের দর্শন দূর থেকে লাভ করেই তার সব সতর্কতা যেন কর্পূরের মত উবে গেল। আর একটু ভাল করে দেখবার জন্য, কাছে গিয়ে ও-রাজমহিমার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য নয়ন ভরে উপভোগ করবার জন্য একটা উদগ্র আগ্রহ ছাড়া অন্য কোন উপলব্ধি আর তার রইল না। কখন, কেমন করে, কোন্ পথ দিয়ে সে এসে লোহার রেলিংয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে একেবারে, তা সে জানে না।

হুঁশ হল একটা গলাধাক্কা খেয়ে। ওই যে দুটি নিশ্চল নিস্পন্দ সৈনিক তোরণের দুই দিকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, তাদেরই নিকটতম লোকটা হঠাৎই যেন চৈতন্যলাভ করল, এবং বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল এই দুঃসাহসী বেয়াদব ভিখিরীর বাচ্চাটাকে শাসন করবার জন্য। শাসন করবার জন্যই ত তারা আছে!

অতবড় পালোয়ানটার হাত থেকে এত বড় গলাধাক্কা। টম উলটে পড়ে ডিগবাজি খেতে খেতে রাস্তার ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ল। আর রাস্তায় সেই যে ভিড় জমেছিল শত শত নিষ্কর্মা দর্শকের, তারা যেন ভারী মজা পেয়ে হেসে উঠল বিদ্রূপের অট্টহাসি। এমন তারা হৃদয়হীন, পরস্পরের দুঃখদৈন্য লাঞ্ছনা অপমানে এতটুকুও তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না।

কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করল একজনের। আর কেউ নয়, প্রাসাদচত্বরে বিচরণশীল রাজপুত্র এডওয়ার্ডের। সৈনিকটা ছুটে আসতেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল তার দিকে, এবং স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে টম ক্যান্টির দিকেও। ভিক্ষুক বালককে মার খেতে দেখে যুবরাজ হঠাৎই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। একবারে তিন লাফে ছুটে এসে তিনি তোরণের গায়ে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল তাঁর পার্শ্বচর লর্ডেরা। অদূরে কুচকাওয়াজে রত সৈনিকেরা তটস্থ হয়ে দাঁড়াল— অধিনায়কের ইঙ্গিত পেলেই তারা ছুটে আসতে পারে যুবরাজের আদেশ পালনের জন্য।

ততক্ষণে যুবরাজের তর্জন শুনে হৃৎকম্প হচ্ছে প্রহরী দুটোর। তিনি সরোষে বলছেন—"দুর্বৃত্ত! কী সাহসে তুমি আমার মহান পিতার দীনতম প্রজার গায়েও হাত তোলো? কী অপরাধ করেছিল ওই শিশু? রাজভক্তিই কি তার অপরাধ? আমাকে দেখবার জন্য এসেই কি তোমার অসন্তোষ-ভাজন হল সে? একটু অপেক্ষা কর তুমি! মহারাজকে বলে কাল প্রত্যূষেই তোমায় আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।"

তারপরই আদেশ—"খোলো সিংহদ্বার। আসতে দাও ওই ভিখারী বালককে! রাজপুত্রকে দেখবার অধিকার সমস্ত প্রজারই আছে। আসতে দাও ওকে ভেতরে। কাছে দাঁড়িয়ে রাজপুত্রকে দেখুক ও।"

ঘর্ঘর শব্দে লৌহতোরণ খুলছে, ওদিকে শত শত কণ্ঠে দর্শকেরা

উঠেছে জয়ধ্বনি করে। এমনই চপল এই নাগরিকেরা। কৌতূহলী বালককে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেতে দেখে ওরাই এইমাত্র বিদ্রূপের অট্টহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ করেছিল, আর এখন সেই ভূলুণ্ঠিত বালককেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে আমন্ত্রিত দেখে তারাই আনন্দে জয়ধ্বনি করছে, যেন টম ক্যান্টি তাদের কতই আদরের আপনজন! যেন দরিদ্রে দরিদ্রে কতই ওদের একাত্মতা!

দ্বার খুলে দিয়ে সেই প্রহরীই হাত ধরে টমকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, তারপর নতমস্তকে যুবরাজের সম্মুখে দাঁড়াল নীরব ক্ষমাপ্রার্থনায়। ফাঁসির ভয় দেখিয়েছেন রাজপুত্র। সে ভয় কার্যে পরিণত হওয়ার তিলমাত্রও বাধা ত কোথাও নেই। এক্ষুনি কোন লর্ডকে দিয়ে পিতার কাছে বলে পাঠালেই, রাজপুত্র এই মুহূর্তে ওর ফাঁসির আদেশ আনিয়ে নিতে পারেন ত!

কিন্তু রাজপুত্র আর ওর দিকে দৃক্‌পাতও করলেন না। চীরপরা, ধূলিমাখা টম ক্যান্টি তাঁর সব মনোযোগ দখল করেছে। তাকে তিনি সদয়ভাবে বলেছেন--"তোমার কি খুবই লেগেছে?"

"না, মহান রাজপুত্র, না। আমার মোটেই লাগে নি।"

পাদরী অ্যানড্রুর গল্পের বইয়ের প্রসাদে শুদ্ধ এবং জমকালো ভাষা সহজেই আসে টমের রসনায়, সে এমন ভাষায় এমন উচ্চারণে উত্তর দিল রাজপুত্রের কথায়, যে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

"তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ক্ষুধা পেয়েছে বোধ হয়? এসো আমার সঙ্গে।"—এই বলে যুবরাজ প্রাসাদের দিকে চললেন। চার পাঁচটা ভৃত্য লাফিয়ে এল—কী করতে এল, তা তারাই জানে। কিন্তু করতে তাদের কিছুই হল না। যুবরাজ অবহেলায় হাত নাড়লেন একবার, অমনি তারা ব্যস্ত হয়ে পিছু হটল।

আগে আগে যুবরাজ, পেছনে টম ক্যান্টি—টম ক্যান্টি চলেছে ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদের পানে। প্রাসাদ খুলেছে দ্বার। স্বপ্ন তার

সার্থক হয় বুঝি। জীবনের স্বপ্ন রূপ ধারণ করে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় বুঝি আজ।

লর্ডেরা অনুসরণ করছেন বই কি, অনুসরণ করাই তো কাজ তাঁদের। কিন্তু দূরে দূরে অনুসরণ করাই নিরাপদ। আদুরে রাজপুত্র কোন্ খেয়ালে কখন কী হুকুম জারি করেন—হঠাৎ নজরে পড়লে বিপদের কারণ হতে পারে।

মারবেল পাথরের সিঁড়ির ওপর নগ্ন পায়ের কাদার ছাপ এঁকে এঁকে টম ক্যান্টি উঠে এল প্রাসাদের ভেতর। যুবরাজের নিজস্ব মহাল এটি। অগুনতি ঘর—বড়, মাঝারি, ছোট। শোবার ঘর, বসার ঘর, বিশ্রামের ঘর, খাওয়ার ঘর, চা খাওয়ার ঘর, পোশাকের ঘর, দরবার ঘর, পড়ার ঘর, খেলার ঘর, দেখাসাক্ষাতের ঘর, ইত্যাদি ইত্যাদি। সোনালী রুপোলী কাজ-করা আবলুস-মেহগনি-ওক কাঠের আসবাব। হাতির দাঁতের টেবিলের পাশে গদি-মোড়া সুখাসন।

একটা আসনে নিজে বসে সমুখে টমকে বসালেন রাজপুত্র। টম বসতে চায় না, জোর করেই তাকে বসতে বাধ্য করলেন। তারপর প্রথমেই হুকুম করলেন খাবার আনতে। খাবার চলে এল রাশিরাশি—নানারকমের—যেমন যেমন খাবারের বর্ণনা পাদরী অ্যান্ড্রুর বইয়ে টম পড়েছে বটে, চোখে কখনও দেখে নি। দেখার আশাও করে নি কোন দিন।

খাবার পৌঁছে গেলেই রাজপুত্র আদেশ দিলেন ভৃত্যদের—"তোমরা চলে যাও।"

এরা কৌতূহলী চোখ নিয়ে সমুখে উপস্থিত থাকলে ভোজটেবিলে বসে খাওয়া আনাড়ি টমের খুব সুখের হবে না, তা জানেন রাজপুত্র। তাই তাঁর এই সুবিবেচনা।

ভৃত্যেরা বিদায় হয়ে গেলে রাজপুত্র টমকে বললেন—"খাও।"

কাল রাত্রে উপবাস গিয়েছে, টম আর দ্বিধা বা বিলম্ব করল না। খেতে বসে গেল এবং খেতে লাগল গোগ্রাসে।

যুবরাজ পাশে বসে কথা কইতে লাগলেন—

"তোমার নাম কি ?"

"যুবরাজকে ধন্যবাদ, টম ক্যান্টি।"

"থাক কোথায় ?"

"জয় হোক যুবরাজের—আঁস্তাকুড় বস্তিতে।"

"আঁস্তাকুড় বস্তি ? আশ্চর্য নাম তো ? কোথায় সেটা ?"

"আজ্ঞে, মহিমান্বিত প্রভু, সেটা এই লণ্ডন শহরেই, তবে এখান থেকে দূর আছে, আর এ-অঞ্চলের জাঁকজমক সৌন্দর্যের সঙ্গে সেদিককার চেহারার কোন মিলই নেই একেবারে।"

"বাবা-মা আছেন ?"

"তা আছেন প্রভু, এবং এক ঠাকুরমাও রয়েছেন। মায়ের কথা বলছি না, কিন্তু অন্য দুজন না থাকলেই বুঝি ছিল ভাল।"

"কেন, তারা তোমায় ভালবাসে না বুঝি ?"

"বাসে না আবার ? তাদের ভালবাসার চিহ্ন আমার সারা গায়ে যে কালশিটের আকারে ফুটে রয়েছে !"

"কালশিটে ?" যুবরাজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন—"তুমি কি বলতে চাও—তারা তোমাকে প্রহার করে ? পিতাকে বলে আমি তাদের কালই টাওয়ারে পাঠাচ্ছি।"

টাওয়ার ?* হ্যাঁ, টাওয়ার দেখেছে টম। নরফোকের ডিউককে যেদিন বন্দী করা হয় রাজাদেশে, নিয়ে যাওয়া হয় টাওয়ারে, সেদিন বহু লোকের ভিড় হয়েছিল টাওয়ারের তোরণে। টমও মিশে গিয়েছিল সেই মিছিলের সাথে মজা দেখার লোভে। হ্যাঁ, টাওয়ার সে দেখেছে। কিন্তু সেখানে তার বাবা আর ঠাকুরমা ? চোর আর ভিখারিনী ? নরফোকের ডিউকের সঙ্গে এক ছাদের নীচে ? তার অধরে হাসি দেখা দিল।

"*মহিমান্বিত যুবরাজ! আমার বাচালতা মার্জনা করবেন।*

* লণ্ডনের রাজদুর্গ। প্রভাবশালী লর্ডদের কারারুদ্ধ করা হত এখানে

কিন্তু টাওয়ার তো ধনী লোকদের জন্য। সেখানে আমার বাবা—”

টমকে কথা শেষ করতে হল না। রাজপুত্র মাথা নাড়লেন—“তা বটে! তা বটে! টাওয়ার ধনীদের জন্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা তা বলে রেহাই পেয়ে যাবে ভেবো না। কী দণ্ড ওদের দেওয়া সম্ভব, তা আমি ভেবে দেখব। আমি যাকে আদর করে কাছে টেনেছি, তাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে আমি বাধ্য আমি ভেবে দেখব। এখন তুমি তাহলে তোমাব আস্তাকুড় বস্তির গল্প আমায় বল।” —রাজপুত্র এগিযে বসলেন উৎসাহের বশে।

আঁস্তাকুড বস্তির গল্প? বলতে টমের লজ্জা করছে। কিন্তু যুবরাজের আদেশ তো লঙ্ঘন করা যায় না। ধীরে ধীবে সে বলতে থাকে—

“আঁস্তাকুড় বস্তির ছেলেরা—আমরা সারাদিন খেলা করেই কাটাই প্রভু! পড়াশুনার বালাই নেই বললেই চলে। মানে, যা আছে তা পাদরী অ্যানড্রুর কাছেই। খেলা বহুরকম। তবে সবই শেষ পর্যন্ত কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির ভিতরে পরিণতি লাভ করে। ঘন, কালো আঠাব মত চটচটে নীলচে কাদা। কখনো হাঁটু পর্যন্ত তাতে ডোবে, কখনো সারা দেহ গড়িযে পড়ে তার ভিতরে। খেলা শেষ করে যখন উঠি, তখন আমরা এক একজন কাদায় ভূত সেজেছি এক একটি।”

রাজপুত্রের মহা মজা লাগছে। এক অদেখা অচেনা জগৎ দূর থেকে যেন তাঁকে হাতছানি দিচ্ছে। সে জগতের হাজার আনন্দের কোন আস্বাদই ত রাজপুত্র পায় নি এতদিন! আহা, যদি একদিনের জন্যও পাওয়া যেত সে আস্বাদ!

রাজপুত্রের চোখ চকচক করছে উত্তেজনায়। তিনি টমকে তাড়া দিয়ে বলেন—“কী মজা! কাদার ভূত এক একটি! কী মজা! তার পর? তার পর?”

“তার পরের মজা আরও বেশী, যুবরাজ!”—সোৎসাহে আঁস্তাকুড়

বস্তির সুখস্বর্গের বর্ণনা দিতে থাকে টম—"দল বেঁধে গিয়ে সবাই পড়ে টেমস নদীর স্রোতে। আথালপাথাল ঢেউ, সেই ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আমরা ভাসি, এক এক গাদা ফেনার মত। এবার বছরের প্রথম দিন হল কি জানেন যুবরাজ, আমাদেরই দলের একটা ছেলে গাইল্‌স অমনি ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়ল একেবারে মাঝনদীতে। সে কী দুরন্ত স্রোত! হাতি ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে স্রোতের টানে! বাচ্চা ছেলে—তা সে যত পাকা সাঁতারুই হোক, সে কি যুঝতে পারে সে কাল-স্রোতের সঙ্গে? দেখতে দেখতে ছেলেটা—"

"অ্যাঁ, তলিয়ে গেল? তলিয়ে গেল, অ্যাঁ?"—যুবরাজের মুখে চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন, কিন্তু সে-যন্ত্রণার ভিতর থেকেও ফুটে বেরুচ্ছে উপভোগের মদির আভাস। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে রাজপুত্রের উপোসী চিত্ত আজ নেশাগ্রস্ত যেন।

"না, তলিয়ে যেতে যেতেও গেল না। কোথা থেকে একটা লোক এসে ঝাপিয়ে পড়ল জলে, আর তীরবেগে সাঁতার কেটে গিয়ে ডুবন্ত ছেলেটার মাথার চুল ধরে টেনে তুলল তাকে।"

"সাবাস!"—যুবরাজ লাফিয়ে উঠলেন একেবারে "সাবাস সাহসী জোয়ান! কে সে? নাম কী তার? কোথায় থাকে সে? তোমাদের পাড়ায়? পিতাকে বলে তাকে আমি হাজার পাউণ্ড বকশিশ দেওয়াব। দেওয়াব নাইট উপাধি।"

কিন্তু সকৌতুকে মাথা নাড়ল টম ক্যান্টি। বলল, "লোকটি আমাদের পাড়ার বা আমাদের জানা লোক নয়। দৈবাৎ সে এসেছিল. হঠাৎই চলে গেল। কূলে উঠেই সে যে কোন্‌দিকে সরে পড়ল আমরা লক্ষ্য করতেই পারলাম না!"

রাজপুত্র বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়েন—"প্রশংসার লোভ ছিল না তার, সত্যিকারের মহৎলোক। আমার মহান্ পিতার গরিব প্রজাদের ভিতর এমন মহাপ্রাণ লোকও আছে জেনে আমি খুশি

হয়েছি। কিন্তু তুমি বল, তোমার আঁস্তাকুড় বস্তির এইরকম সব আনন্দের কথা আমায় আরও বল। দুর্ভাগ্য আমার, নিজে ওরকম-ভাবে আনন্দ করার সুযোগ আমি জীবনে কখনও পাব না। তোমার মুখ থেকে শুনেও যদি খানিকটা আনন্দ পাই- ”

আবার কৌতুকে নেচে উঠল টম ক্যান্টির দুই চোখ—“ওইরকম আনন্দ পাওয়ার সুযোগ নেই বলে প্রভু কি দুঃখিত ?”

“দুঃখিত নই ?”—জোর দিয়ে বলে ওঠেন যুবরাজ—“ইংলণ্ডের সিংহাসনের বিনিময়েও যদি আমি তোমার মত ওইরকম ছেঁড়া কাপড় পরে কাদায় হাবুডুবু খেতে পেতাম, আর তার পরে সাতার কাটতে পেতাম টেমস নদীর উত্তাল তরঙ্গে—”

টম যেন বড চিন্তাকুল—বলল, “কী অদ্ভুত পার্থক্য যুবরাজের রুচির সঙ্গে এই ভিখারী বালকের রুচির! আপনি আমার মত কাদায় হাবুডুবু খাওয়ার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করতে রাজী, আর আমি—আমি—সিংহাসন তো নেই বিসর্জন দেবার মত মূল্যবান কিছুই আমার নেই যখন, এই জীবনের বিনিময়েও যদি একবার এক মুহূর্তের জন্য আপনার মত ওইরকম সুন্দর মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত করতে পারতাম—”

রাজপুত্র লাফিয়ে উঠলেন—“তার বাধাটা কোথায়? তোমার আমার দুজনের সাধই তো একসাথে পূর্ণ হতে পারে। অর্থাৎ তোমার সাধটা পুরোপুরি, আমার সাধটা আংশিকভাবে পূরণ করার এইত সুযোগ! এই আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমার কাপড় তুমি পর, তোমার কাপড় আমি পরি। দুজনের মনের কামনাই পূর্ণ হোক।”

ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল বইকি টমের! তবু, রাজপুত্র নিজেই যখন প্রস্তাব করেছেন, এবং তিনি যখন সমুখেই রয়েছেন আপদে বিপদে তাকে আগলাবার জন্য, তখন মিথ্যে ভয়ে সুযোগটা সে হারিয়ে বসবে? সোজা কথা নয়। সত্যিকারের রাজবেশে অঙ্গ-

সজ্জা ! গল্প শুনলে আঁস্তাকুড় বস্তির ছেলেবুড়ো সকলের তাক্ লেগে যাবে !

টম রাজী হয়ে গেল !

তখন দরজা বন্ধ করে দুই বালকে শুরু করল ছেলেখেলা ! টমের পোশাক পরতে রাজপুত্রের দুই মিনিটও লাগল না, কিন্তু সময় লাগল রাজপুত্রের পোশাকে টমের শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করতে ! রাজপুত্র নিজে পরিয়ে না দিলে টমের সাধ্যও ছিল না মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেই আশ্চর্য অনভ্যস্ত সাজসজ্জা যথাযথ অঙ্গে সন্নিবেশ করার।

দুইজনেরই সাজসজ্জা শেষ হল।

টম ক্যান্টি ঘন ঘন নিজের দেহের উপর দিয়ে দুই চোখ বুলিয়ে আনে। তার সে চোখে ভীতু ভাব একটা। অবশ্য গভীর সার্থকতার আনন্দ সেই ভীতু ভাবের উপরেও একটা জৌলুস এনে দিয়েছে, যেটা যে কোন মুহূর্তে সামান্য প্রতিকূল ঘটনার সংস্রবে এলেই কর্পূরের মত উবে যেতে পারে।

আর রাজপুত্র ? তাঁর আনন্দ গভীর এবং একান্ত বাস্তব। সকৌতুকে তিনি টমের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, ততোধিক আনন্দে নিজের দিকে। শেষে টমের হাত ধরে টেনে নিয়ে তিনি এক বৃহৎ আয়নার সমুখে দাঁড়ালেন। গৃহপ্রাচীরে বিলম্বিত ভিনিস-দেশায় মহামূল্য কাচে নির্মিত সেই দর্পণের ভিতর পাশাপাশি ফুটে উঠল দুটি বালকের মূর্তি।

দুইজনেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই যুগল মূর্তির দিকে। কী দেখছে ? ভিখারীর রাজবেশ, এবং রাজপুত্রের ভিখারী বেশ ? হ্যাঁ, প্রথম কয়েক মুহূর্ত দুজনে তাই দেখছিল বটে ! কিন্তু এখন ? পরিচ্ছদ ছেড়ে মুখের উপর তারা উভয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে !

দেখতে দেখতে দুজনের মুখেই ফুটে ওঠে গভীর বিস্ময়ের ছাপ। একবার দেখে আয়নার ভেতরকার প্রতিবিম্বের দিকে, একবার দেখে

পরস্পরের রক্তমাংসের দেহের দিকে, যা ঠিক গায়ে গা লাগিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে মুখে ফুটেছিল বিস্ময়ের ছাপ, তারপর মুখ থেকে বেরুলো বিস্ময়ের অস্ফুট উক্তি। দুই জনেরই। প্রায় একসাথেই!

তারপর এ তাকায় ওর দিকে, ও তাকায় এর দিকে। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করেন—"এর অর্থ কী? কী এ?"

টম ভয়ে ভয়ে বলে—"এ যে কী, তা মুখে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা যেন আমার কোনদিন না হয়, যুবরাজ!"

"তা হলে প্রকাশ আমিই করি। তোমার আমার দুজনের আকৃতিতে কোথাও তিলমাত্র পার্থক্য নেই। একই দেহবর্ণ, একই রঙের চুল, সমান উচ্চতা, একই দোহারা দেহ—এর মানে কী?"

"আমি জানি না প্রভু!"—জবাব আসে টম ক্যান্টির কম্পিত কণ্ঠ থেকে।

তার কথায় কর্ণপাত না করে যুবরাজ বলে চলেন—"আজ যদি নগ্ন দেহে তুমি আর আমি একসাথে রাজপথে বেরিয়ে পড়ি, কেউ যদি আত্মপরিচয় না দিই, এমন লোক কেউ নেই যে তোমাকে ভিখারী আর আমাকে রাজপুত্র বলে চিনতে পারবে।"

টম ক্যান্টির কী জানি কেন মনে হল এরকম একটা বিসদৃশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল না, এ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সাহায্য করা তার পক্ষে অপরাধ হয়েছে, এবং যত শীঘ্র সম্ভব এর অবসান ঘটিয়ে এখান থেকে প্রস্থান করা উচিত হবে তার পক্ষে।

সে বড় সংকুচিত হয়ে বলল—"যুবরাজ অনুমতি করুন—আমি এবার যাই।"

"কেন? কেন?"—যুবরাজ ব্যস্ত হয়ে তার হাত ধরলেন—"কেন ভাই, যাবে কেন? এরই ভিতর যেতে চাইছ কেন? থাক না আর একটু!"

টম হঠাৎ নিজের অজান্তেই একটা কাতর শব্দ করল।

যুবরাজ চমকে উঠলেন। টমের হাত তিনি তেমন জোরে তো ধরেন নি! আর তেমন জোরে ধরলেই বা টমের মত সুস্থ সবল বালক তাতে ককিয়ে উঠবে কেন?

যুবরাজ তাড়াতাড়ি ওর হাত ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সেই হাত-খানিই আবার সযত্নে নিজের হাতে তুলে দেখতে লাগলেন পরম দরদের সঙ্গে—"এ কী! এ যে অনেকখানি ছড়ে গিয়েছে! বেশ গভীর হয়ে!"

টম তেমনি সংকোচের সঙ্গে বলছে "ও কিছু নয় যুবরাজ, ও কিছু নয় ওই প্রহরীটা যখন আমাকে ধরেছিল—তার হাতে তো লোহার দস্তানা আছে! তারই জোর চাপ লেগে—"

"কী?"—টিউডর রক্ত লাফিয়ে উঠল ক্রুদ্ধ রাজপুত্রের মাথায়। "হতভাগা সিপাহীটা এমন আহত করেছে তোমাকে? ওকে আমি যদি ফাঁসিতে না লটকাই—"

বলতে বলতে পার্শ্ববর্তী টেবিলের উপর থেকে কী একটা বস্তু রাজপুত্র তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন, আর ছুটে পাশের ঘরে সেটিকে রেখে এসেই ঘরের দরজা খুলে ফেললেন ঝনাত করে—

"তুমি বসো, আমি ওকে শায়েস্তা করে এক্ষুনি আসছি।"—এই বলে নিজের পরিহিত চীরবস্ত্রের কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যুবরাজ ছুটে বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে, নেমে গেলেন মর্মরে-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে, দৌড়ে চলে গেলেন চত্বর পেরিয়ে, কুচকাওয়াজ-রত সৈনিকদের পাশ কাটিয়ে, লর্ডদের ভিড়ের মাঝখান দিয়ে। বেরিয়ে গেলেন রাজপুত্র।

ভবিতব্য!

২

"খোলো দ্বার! খোলো শিগগির! দুর্বৃত্ত প্রহরীকে আমি এমন শিক্ষা দেব—"

রাজপুত্র কথা শেষ করবার আগেই সশব্দে তোরণদ্বার খুলে গেল। নিজের আক্রোশেই খুলে দিল প্রহরী। ছেঁড়া কাপড় পরা রাজপুত্রকে দেখে সে তাঁকে রাজপুত্র বলে চিনতে পারে নি, অন্য সবাইয়ের মত সে-ও ভেবেছে—এ সেই ভিখারী বালকটাই ফিরে এসেছে আবার। এরই জন্য প্রহরীকে কঠোর তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে রাজপুত্রের কাছ থেকে, এখন তো আর রাজপুত্র সঙ্গে নেই ওর, এবার ওকে দেখে নেবে প্রহরী!

স্পর্ধা দেখ! রাস্তার কুকুরের চাইতে বেশী মুরোদ নেই যার, সে কি না রাজবাড়ির প্রহরীকে শাসায় 'আমি তোকে শিক্ষা দেব' বলে! এর প্রতিফল যদি না দেওয়া হয়—

রাজপুত্রও ছুটে বেরুলেন খোলা দরজা দিয়ে, ক্রুদ্ধ প্রহরীও হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল তাঁর ঘাড়। বালক—গায়ের জোরে তো প্রহরীর সঙ্গে রাজপুত্রের পারবার কথা নয়! তার উপর, নিজেরই তৃণাদপি তুচ্ছ ভৃত্যের কাছ থেকে এরকম কল্পনাতীত ধৃষ্ট ব্যবহার পাওয়ার কথা তিনি তো ভাবতেও পারেন নি!

ঘাড়টি ধরেই রাজপুত্রের মাথায় সজোরে এক গাঁট্টা—তারপর "যা বেয়াদব ভিখিরীর বাচ্চা, নিজের আঁস্তাকুড়ে ফিরে যা!"—এই বলে প্রহরী রাজপুত্রকে দিল এক ধাক্কা। টম ক্যান্টি যেভাবে কিছুক্ষণ আগে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার মাঝে উলটে পড়েছিল, ঠিক সেই-ভাবেই এখন উলটে পড়লেন যুবরাজ, আর পথের উপর দর্শকের ভিড় থেকে তখন যেমন উঠেছিল বিদ্রূপ-হাস্যের গররা, ঠিক তেমনি করেই এখনও উঠল রাজপুত্রের দুর্দশা থেকে।

যুবরাজ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ধমনীতে টিউডর-রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কেমন করে এমন অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হল, তিনি ধারণা করতে পারছেন না। তাঁর মাথাতেই আসছে না যে জীর্ণচীর পরিধান করে আসার দরুন কেউ তাঁকে রাজপুত্র বলে চিনতেই পারছে না। ভবিতব্য ছাড়া আর কি!

ক্রুদ্ধকণ্ঠে তর্জন করে তিনি বললেন "ওরে—পাষণ্ড! তোর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে। আমি যুবরাজ, প্রিন্স অব্ ওয়েলস! আমার দেহ পবিত্র, এ দেহে আঘাত করার একমাত্র সাজা মৃত্যু!"

সে কী হাসির ঘটা! যত হাসে ছুটো প্রহরী, তত হাসে ত্বশো দর্শক। একটা অট্টহাস্যের রোল! প্রহরী হেসেই ক্ষান্ত হল না, তেড়ে এসে আবার ছু'ঘা বসিয়ে দিল রাজপুত্রকে—সঙ্গে সঙ্গে টিটকারি- "বদ্ধ পাগল! যুবরাজ একবার হেসে কথা কয়েছেন, অমনি মাথা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে!"

বদ্ধ পাগল! প্রহরীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোটা জনতাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"বদ্ধ পাগল!" সেই সঙ্গে, পাগলের প্রতি যা চিরকালের সর্বসম্মত ব্যবহার, তাই শুরু করল সেই ত্বশো লোক —ইটপাটকেল বৃষ্টি আর নোংরা আবর্জনা গায়ে ছুঁড়ে মারা!

ক্রমাগত এই আক্রমণ কতক্ষণ সইতে পারে একটা বালক? মাথায় ছুই একটা ঢিল পড়তেই রাজপুত্রকে পিছু হঠতে হল। আর তিনি পিছু হঠতেই তাঁকে পিছন থেকে তাড়া করল সেই নিষ্ঠুর জনতা। ঢিল, কাদা, ছেঁড়া জুতো, পচা ডিম! মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাজপুত্রকে ছুটতে হল এইবারে। মাঝে মাঝেই হাঁফ ছাড়বার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পড়ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলছেন—"তোরা সব বিদ্রোহী, তোদের প্রত্যেককে ফাঁসি দেব আমি। আমি যুবরাজ এডোয়ার্ড, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্।"

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে দিচ্ছে না তাঁকে। নূতন উৎসাহ নিয়ে দৌড়ে

আসছে জনতা। এমন মজা তারা অনেকদিন পায় নি। পাগল অনেক দেখা যায় পথে ঘাটে, কিন্তু নিজেকে যুবরাজ বলে জাহির করতে চায়, এমন পাগল কেউ কখনও দেখে নি। শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শেয়াল শিকার করার মজা হার মেনে যায় এর কাছে। তারা দূরে, আরও দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অভাগা রাজপুত্রকে।

রাজপুত্র ক্লান্ত, অবসন্ন, কথা বলতে গেলে ধুঁকছেন তিনি। আর ছুটে পালাবার শক্তি নেই। এক সময়ে তিনি হতচেতনের মত লুটিয়ে পড়লেন রাস্তার ধূলি-জঞ্জালের মাঝে। যাঃ, ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেল? তা হলে আর ওর পিছনে ছুটে লাভ কি? যারা মজার লোভে পাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, মজা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে পড়ল—নিজেদের কাজ রয়েছে তাদের। দেখতে দেখতে রাজপথ জনশূন্য, একটা পাগল ছেলে মাত্র— পড়ে আছে ধূলি আর রক্তমাখা দেহে।

অবশেষে জ্ঞান ফিরে এল। অতিকষ্টে উঠে বসলেন রাজপুত্র। এত আকস্মিক, এমন সাংঘাতিক এই বিপর্যয়—একে ঠিক ধারণার ভিতর তিনি আনতে পারছেন না। মাত্র দুই ঘণ্টা আগে তিনি জাতির আরাধ্য দেবতা ছিলেন, মহাশক্তিধর রাজ্যেশ্বরের চোখের মণি, ইঙ্গিতমাত্রে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য শত শত দাসদাসী ছিল তাঁর, ছিল হাজার হাজার অস্ত্রধারী সৈনিক। হঠাৎ এ কী হল? চোখের পলকে রাজৈশ্বর্যহারা হয়ে তিনি দীন ভিক্ষুকে পরিণত! সবচেয়ে নির্মম পরিহাস নিয়তির—তিনি যে তিনিই, এই অত্যন্ত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ কথাটাই তিনি লোককে বিশ্বাস করাতে পারছেন না।

কী উপায়ে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবেন আবার? এই দুরাচার প্রহরীরা ত তাঁকে ঢুকতেই দেবে না! কারও সাহায্য না পেলে, কেউ প্রাসাদে ঢুকে রাজার কানে তাঁর প্রিয় পুত্রের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা আগে না প্রকাশ করলে, রাজার আদেশে

কোন উঁচুদরের কর্মচারী এসে হাত ধরে তাঁকে না নিয়ে গেলে, তাঁর নিজের গৃহে তিনি ঢুকতেই পারবেন না। এমন আশ্চর্য অবস্থায়ও মানুষ পড়ে?

কিন্তু সাহায্য পাওয়া যাবে কার কাছে? কে তাঁকে চিনবে এই চরম দুরবস্থার ভিতরেও? কে বিশ্বাস করবে তাঁর কথা? রাজপ্রাসাদ থেকে তিনি বহু দূরে এসে পড়েছেন। তাড়া খেতে খেতে, লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে, যেদিকে পেরেছেন, সেইদিকেই ছুটেছেন তিনি। ঠিক কতদূর এসেছেন? এ কোন্ স্থান? কিছুই ধারণা নেই তাঁর। প্রাসাদ থেকে বাইরে তাঁকে মাঝে মাঝে আসতে হয় ঠিকই, কিন্তু তখন আগে পিছে মিছিল থাকে সহস্র মানুষের, আশে পাশে অনুগত লর্ডেরা থাকেন তাঁর খবরদারি করার জন্য, কোন পল্লীর কোন্ পথ দিয়ে কোথায় তিনি পৌঁছোচ্ছেন, খবর নেবার দরকার কখনও অনুভব করেন না। লণ্ডন শহর ষোল আনাই অজানা তাঁর কাছে।

কিন্তু ওই, ওই গির্জাটা? মেরামতির জন্য ভারা বাঁধা রয়েছে যার গায়ে? সমুখে ওই পুকুর, ওদিকে ওই লম্বা লম্বা গাছগুলো? এ জায়গা তো তাঁর চেনা চেনা বোধ হয়! হ্যাঁ। এ নিশ্চয় ক্রাইস্ট চার্চ। মঠধারী সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে গির্জার তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হাতে নিয়ে মহারাজ অষ্টম হেনরি—যুবরাজ এডোয়ার্ডের মহিমান্বিত পিতা, এখানে এই গির্জার সংশ্রবে একটি অনাথ আশ্রম খুলেছেন সম্প্রতি। সেই অনাথ আশ্রমের উদ্বোধনের জন্য যুবরাজকেই আসতে হয়েছিল, এই কয়েকদিন আগেই। এই তো সেই গির্জা। ওই তো অনাথ-আশ্রমের বালকদেরও দেখা যায় গির্জার মাঠে, পুকুরের পাড়ে। হয়েছে! উপায় একটা হয়েছে! এরা বিশ্বাস করবেই তাঁর কথা। এরা তো তাঁর পিতারই অন্নে জীবনধারণ করছে। এখানে ঢুকে পড়লেই রাজ-প্রাসাদে খবর পাঠাবার একটা উপায় হবেই।'

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে যুবরাজ

গির্জার দিকে চললেন, প্রবেশ করলেন তার হাতার ভিতরে, গিয়ে দাঁড়ালেন সেই অনাথ বালকদের সমুখে—যারা জীবনধারণ করছে তাঁর পিতারই অন্নে।

ছেলেগুলো খেলছিল। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই একজন জিজ্ঞাসা করল—"এই! কী চাস তুই?" ছেঁড়া কাপড়পরা ভিখারীর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলার প্রয়োজন বুঝল না অনাথ আশ্রমের বালকেরাও।

যুবরাজ এই তাচ্ছিল্যের জন্য খেপে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন একটু। সযত্নে ক্রোধকে সংযত করে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—"শোনো ছেলেরা! মঠাধ্যক্ষকে গিয়ে বল যে এডোয়ার্ড প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চান।"

ছেলেরা হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ—তারপরই অবিশ্বাসের হাসি।—প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ তাদের এখানে এসেছিলেন, তিনি মঠাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠাবেন, এটা অসম্ভব না হতে পারে, কিন্তু প্রিন্সের সঙ্গে এই ন্যাকড়া-পরা ছোকরার কী যোগাযোগ থাকতে পারে? এ-ছেলেটা ধাপ্পা দিচ্ছে নিশ্চয়।

সন্দেহটা ভাষায় প্রকাশ করল তারা—"তুমি প্রিন্সের কাছ থেকে আসছ?"

প্রিন্সের আর ধৈর্য রইল না, বললেন—"প্রিন্সের কাছ থেকে আসিনি, আমিই প্রিন্স। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্, এডোয়ার্ড।"

আর যায় কোথায়? আবার সেই অতি-পরিচিত অট্টহাসির রোল—বিদ্রূপ, টিটকারি, "পাগল, পাগল" বলে চিৎকার।

রাজপুত্রের আর সহ্য হল না। এতক্ষণের পুঞ্জীভূত রোষ ফেটে পড়ল একেবারে। লাফ দিয়ে নিকটতম ছেলেটার ওপর পড়ে তাকে দুই ঘুষি লাগিয়ে দিলেন তিনি।

এর পরিণাম হল ভয়ংকর। অনাথ বালকেরা দল বেঁধে লাফিয়ে

পড়ল রাজপুত্রের উপর, লেলিয়ে দিল কুকুর তাঁর উপরে। বেধড়ক মার খেতে খেতে, কুকুরের কামড় খেতে খেতে আছাড়ি-বিছাড়ি খেতে খেতে, রক্তাক্ত দেহে যুবরাজ যখন কোনমতে গির্জা থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি সত্যিই আধমরা।

মরার মতনই পথের পাশে একটু নিভৃত জায়গা খুঁজে নিয়ে তিনি পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ। আকাশে তখন মধ্যাহ্নসূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। ক্ষুৎ-পিপাসায় জর্জর হয়ে রক্তমাখা দেহে রাজপুত্র ধুলোর ভিতর গড়াগড়ি দিচ্ছেন দারুণ যন্ত্রণায়। দেহের যন্ত্রণা বেশী. না মানসিক যন্ত্রণা বেশী, তা হিসাব করে বলে দেওয়া শক্ত।

. .

এখন যেখানে ফ্যারিংডন স্ট্রীট, সেইখানে সেকালে কুলুকুলু করে বয়ে যেত টেমসের এক শীর্ণা উপনদী। উপর দিয়ে পুলও আছে, আবার হেঁটে পার হওয়ারও বাধা কিছু নেই। রাজপুত্র হেঁটেই পার হচ্ছেন। অতি ধীরে ধীরে। নগ্ন চরণে জলের শীতল স্পর্শ বড়ই ভাল লাগছে! আহা. ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত সেই চরণ দু'খানি, রাস্তার পাথর আর কুকুরের দাঁত 'সমানভাবে তাতে দাগ রেখে গিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়েছে। আকাশ কালো হয়ে এসেছে মেঘে মেঘে। দমকা হাওয়া বইছে। রাস্তায় নেই আলো, ভবিষ্যতের পানে তাকিয়েও রাজপুত্র যেন আলো দেখতে পান না এতটুকু। সমুখে দীর্ঘ রজনী, আঁধার, ঠাণ্ডা, সংকটসংকুল! পদে পদে মানুষ পশুর হিংস্র দন্ত-নখর উদ্যত হয়ে আছে পথহারা স্বজনহারা ভাগ্যবিড়ম্বিত বালকটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবার জন্য।

ভয়ে আর রাজপুত্র পথের নিশানা জানতে চাইছেন না কারও কাছে। প্রশ্ন করলেই প্রকাশ হয়ে পড়বে যে তিনি এ-অঞ্চলে নবাগত। অপরিচিত ভিক্ষুক বালকের উপরে অকারণে খানিকটা অত্যাচার করার লোভ কেউই সংবরণ করতে পারবে না। ভাগ্য!

বিরূপ ভাগ্যের হাতেই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে, যেদিকে দু'চক্ষু যায়, রাজপুত্র সেইদিকেই চললেন।

কতক্ষণ চললেন, তা তাঁর নিজেরই বুঝি হুঁশ নেই।

হুঁশ ফিরে এল, হঠাৎ একটা সবল হস্তের আকর্ষণ নিজের কাঁধের উপর অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশ্রী গালাগালি, আর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন—"এত রাত করে ফিরছিস যে! চল্ আগে আঁস্তাকুড় বস্তিতে, তোর হাড় আর মাস যদি আমি আলাদা করে না ফেলি—"

আবার একটা কুৎসিত দিব্বি।

রাজপুত্রের কিন্তু গালাগালি বা দিব্যিটিব্যির দিকে কান নেই, পশুটার থাবার নীচে কাঁধটা যে গুঁড়িয়ে যেতে চাইছে, তাবও তেমন স্পষ্ট অনুভূতি নেই তার। বুকের ভিতর রক্তটা নেচে উঠছে —'আঁস্তাকুড় বস্তি" এই শব্দটি শুনে। এ তাহলে আঁস্তাকুড় বস্তির লোক, যেখান থেকে এসেছিল সেই অপয়া টম ক্যান্টি. রাজপুত্রের এই মর্মান্তিক ভাগ্য বিপর্যয়ের মূল কারণ সেই ভিখারী বালকটা। আঁস্তাকুড বস্তি! যীশু করুণাময়! তুমি তাহলে ত্যাগ কর নি আমাকে।

বড় আশায় বুক বেঁধে রাজপুত্র বললেন—"আঁস্তাকুড় বস্তি? তুমি তাহলে টম ক্যান্টির বাবাকে চেনো? আমাকে নিয়ে চল, নিয়ে চল তার কাছে!"

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল জন ক্যান্টির! এ ছোকরা বলে কী? টম ক্যান্টির বাবা? এ হতভাগা কি নিজের বাবাকে দেখেও চিনতে পারছে না? রাজপুত্রকে দুই হাতে সবলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, সে তাঁর মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে গেল নিজের নোংরা দুর্গন্ধ মুখখানা, আর ভালুকের মত ঘোঁতঘোঁত করে বলল—"তোর হল কী? হ্যাঁরে বদমাইশ, হল কি তোর? নিজের বাপকে তুই চিনতে পারছিস না? গল্পের বই পড়ে পড়ে একেবারে মাথাটা খারাপ করে ফেলেছিস?"

নিজের বাপ ? এই তাহলে টম ক্যান্টির বাবা ? রাজপুত্র একবার তাকিয়ে দেখলেন এই নরপশুটার দিকে। না, টম ক্যান্টি মিছে কথা বলে নি। এ লোক টম ক্যান্টিকে প্রতিনিয়ত নরকযন্ত্রণা দিচ্ছে, একথা বিশ্বাস করতে একটুও বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু সে-চিন্তা এই মুহূর্তে অবান্তর। তিনি জন ক্যান্টির হাত দুখানা ধরে ফেললেন। কাতর হয়ে বলে উঠলেন—"ভদ্র! আর দেরি করো না। আমি তোমার ছেলে টম নই, আমি রাজপুত্র, প্রিন্স অব ওয়েলস্। টম আছে রাজপ্রাসাদে। তুমি আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলেই টম বেরিয়ে আসতে পারবে, এবং তুমিও মহারাজের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাবে। তুমি আর এক মুহূর্তও দেরি করো না, চল।"

জন ক্যান্টি হতবাক, হতভম্ব। যা ভেবেছিল সে, তাই ঠিক তাহলে। ছেলেটা বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে! রাজপুত্র! প্রিন্স অব ওয়েলস্। মহারাজের কাছ থেকে পুরস্কার! চরম একেবারে! পাদরী অ্যানড্রুকে সমুখে পেলে এক্ষুনি খুন করে ফেলে জন ক্যান্টি। পড়িয়ে পড়িয়ে রাজারাজড়ার গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে সেই এ দশা করেছে তার ছেলের!

কিন্তু পাদরী এখন থাকুক। এই পাগল ছেলেটাকে শায়েস্তা করা দরকার এক্ষুনি। মারের চোটে ভূত পালায়, আর এর পাগলামিটা পালাবে না? সে জোর একগোঁট্টা মারল রাজপুত্রের মাথায়।

"পাষণ্ড!"-- আর্তনাদের ভেতর দিয়েও ফুটে বেরুলো রাজপুত্রের দুর্জয় ক্রোধ, আর তাতেই জন ক্যান্টি যেন খেপে গেল আরও। হিঁচড়ে হিঁচড়ে সে টেনে নিয়ে যেতে লাগল রাজপুত্রকে, মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়বার জন্য থামে, আর সেই অবসরে লাথি আর ঘুষি মারে অসহায় বালকের মাথায় পিঠে, সর্বদেহে। আঁস্তাকুড় বস্তি ওখান থেকে বেশী দূর নয়। তার এলাকায় এসে পড়তেই চেনা-জানা লোক অনেক এসে ঘিরে ধরল জন ক্যান্টিকে।

"কী হল হে ক্যান্টি? ছেলেটাকে অমন বেধড়ক পিঠছ কেন? মরে যাবে যে।"

"'ছেলেটা' কাকে বল তোমরা? জান না এ কে? খোদ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্! বলছে ও প্রিন্স অব্ ওয়েলস্। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে মারতে পারি—এমন দুঃসাহস আমার হতে পারে কখনও? আমি গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছি প্রিন্স বাহাদুরের!"

ভারী মুখরোচক খবর। আঁস্তাকুড় বস্তির ছেলেবুড়ো, সবাই ধেইধেই করে নাচতে লাগল—"টম পাগল হয়ে গিয়েছে! পাগল হয়ে গিয়েছে টম ক্যান্টি!" টমের ওপর যে তাদের বিশেষ রাগ আছে কারণ, তা নয়। কিন্তু কেউ একটা গুরুতর বিপদে পড়েছে শুনলেই এ-জাতীয় লোকের একটা পাশবিক আনন্দ হয়, সেই আনন্দের অভিব্যক্তি এই ধেইধেই নৃত্য, আর উল্লসিত কোলাহল।

উৎসাহ পেয়ে জন ক্যান্টি আরও নির্মম হয়ে উঠল। সে যে কীরকম সুদক্ষ শাসক, তাই সবাইকে দেখাবার জন্য সে ক্রমাগত প্রহার চালাতে লাগল। রাজপুত্র অবসন্ন, মৃতপ্রায়, কিন্তু মরিয়া। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে টম ক্যান্টির বাবার দ্বারা তাঁর কোন সাহায্য হবে না, বরং নিজের কোটরে নিয়ে পুরতে পারলে এমনি ধারা অমানুষিক অত্যাচারই সে চালাতে থাকবে তাঁর ওপরে। তাই তিনি এখন প্রাণপণ চেষ্টা করছেন জন ক্যান্টির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আর সে চেষ্টার ফল হচ্ছে আরও প্রহার। আরও প্রহার! আরও! আরও!

হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে একটিমাত্র করুণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আহা! ছেলেটাকে মেরে ফেললে যে! থামো! থামো!"

সঙ্গে সঙ্গে এক বৃদ্ধ এসে চেপে ধরল জন ক্যান্টির হাত। তখন জন ক্যান্টির মাথায় খুন চেপেছে, সে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে

দিল সেই বুড়োকে—"আমার ছেলেকে আমি মেরেই ফেলি যদি, তোর তাতে কী ?"

কারও যে তাতে কথা কওয়ার অধিকার নেই, সেইটে প্রমাণ করবার জন্যই যেন জন ক্যান্টি আবার কিল ঘুষি চালাতে লাগল রাজপুত্রের ওপরে। বৃদ্ধের কাছে সে দৃশ্য অসহ্য। এই পৈশাচিক কাণ্ড থামিয়ে দেওয়ার জন্য আবারও সে এসে হাত ধরল ক্যান্টির। এবার আর ক্যান্টি ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল না, পাশে ছিল অন্য একজনের হাতে এক মোটা লাঠি, তাই এক টানে ছিনিয়ে নিয়ে বুড়োর মাথায় বসিয়ে দিল সজোরে এক ঘা।

একটা গোঁগোঁ আওয়াজ করে বুড়ো লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। আশ্চর্য এই যে জনতার ভেতর থেকে একটা লোকও এতে প্রতিবাদ করল না, বা ভূপতিত বৃদ্ধের সাহায্যের জন্য এক পা এগিয়ে এল না। "যেমন কর্ম তেমনি ফল"—এই জাতীয় মন্তব্য করতে করতে তারা সোল্লাসে অনুসরণ করল জন ক্যান্টির, যে নাকি তখন বন্দী রাজপুত্রকে টানতে টানতে এনে ফেলেছে নিজের বাড়ির দরজায়।

কারাগারে প্রবেশ করবার আগে রাজপুত্রের আর একটা ব্যাকুল প্রয়াস মুক্তিলাভের জন্য, আর একপ্রস্থ নির্মম প্রহার এবং ঝড়ের বেগে অভিসম্পাত আর গালিগালাজ জন ক্যান্টির তরফ থেকে, জনতার শেষ উন্মত্ত ঐকতান চিৎকার জন ক্যান্টির সমর্থনে—তার পর যবনিকাপাত! জন ক্যান্টি বাড়ির সিঁড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল তার বন্দীকে নিয়ে।

এই জনতা? নির্মম?—তা হবে। অপরিণত যাদের বুদ্ধি, তারা বুঝি নির্মমতাতে আনন্দ পায় ইঁদুরছানার পায়ে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে চলতে থাকে একটা শিশু, তাকে ঘিরে আনন্দ করতে থাকে পল্লীর আরও পঞ্চাশটা ছেলেমেয়ে। অরণ্যচর নরভুক বর্বরেরা ঘিরে দাঁড়ায় তাদের বন্দীকে, এক একজন ছুটে

আসে বল্লম নিয়ে, আর বিঁধিয়ে দেয় সেই বল্লমের ফলা বন্দীর হাতে পায়ে উরুতে বাহুতে। বুকে নয়, মাথায় নয়—ওসব জায়গায় আঘাত লাগলে বন্দী তাড়াতাড়ি মরে যেতে পারে, উৎসবের আনন্দ শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নিষ্ঠুরতার খেলাকে দীর্ঘস্থায়ী করাই দরকার।

ওই ইঁদুরছানার ওপরে শিশুদের অত্যাচার, ওই আগার্থ-বন্দীর উপর প্রাথমিক বল্লমবৃষ্টি বর্বরদের—আর আঁস্তাকুড় বস্তির অধিবাসীদের এই সোল্লাস কোলাহল এক ভাগ্যহীন বালকের যন্ত্রণ দেখে, একই শ্রেণীর ব্যাপার এরা। অশিক্ষা, বিচারবুদ্ধির অভাব আর চারিত্রিক নিষ্ঠুরতাকে সংযমের বাঁধনে বেঁধে রাখবার অক্ষমত —এরাই মূল কারণ এই রাক্ষসবৃত্তির।

৩

রাজপুত্রের ভাগ্যবিড়ম্বনার করুণ ইতিহাস এখন থাকুক। ময়ূর-পুচ্ছে সজ্জিত দাঁড়কাক, অর্থাৎ রাজপরিচ্ছদে ভূষিত ভিখারী বালকের দশাটা, আসুন একবার দেখে আসি।

চীরবস্ত্র পরে রাজপুত্র ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, ভেতরে রইল টম ক্যাণ্টি, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্-এর বসনে অলংকারে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত হয়ে। ভারী অদ্ভুত লাগছে তার। অস্বস্তির সঙ্গে পরিতৃপ্তি ওতপ্রোতভাবে মেশানো। অস্বস্তির কারণ শুধু এই যে, রাজপুত্র ফিরে আসবার আগেই অন্য কেউ যদি এ-কক্ষে প্রবেশ করে, একটা মহা হইচই সে নিশ্চয়ই করবে—অচেনা টমকে এ অবস্থায় দেখে। বেচারী টমের মাথায় একথা ঢুকছে না যে টমের টমত্ব ঢাকা পড়ে গিয়েছে রাজপুত্রের পোশাকের অন্তরালে. তাকে চিনে বার করা অন্য লোক দূরে থাকুক, তাঁর নিজের মায়ের পক্ষেও এখন অসম্ভব।

অস্বস্তি আছে বইকি, কিন্তু আনন্দও অপরিমিত। বৃহৎ আয়নায় সে বার বার নিজেকে দেখছে। সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। চমৎকার মানিয়েছে, টম ক্যাণ্টি যে রাজপুত্র নয়, একথা কে বলবে এখন? কী আশ্চর্য জৌলুস এই হীরেখানার, যা টমের মাথার আঁটো টুপির ওপরে জ্বলজ্বল করছে একটা শুকতারার মত! কী মনোরম বর্ণালীর ঢেউ খেলছে তার অঙ্গরাখায়, কুর্তায়, ট্রাউজারে! সোনায় মুক্তায় ঝলমল খুদে তরোয়ালখানিরই বা কী বাহার!

টম একবার এ-সোফায় বসে, একবার ও-সোফায়! স্প্রিং-দেওয়া গদি কোথায় তলিয়ে যায় তাকে নিয়ে। টম নিজেকে খুঁজে পায় না যেন। হাতির দাঁতের টেবিলে খেলনা, হাতি ঘোড়া ড্রাগন

দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার-

সবল হস্তের আক্রমণ নিজের কাঁধের উপর অনুভব করে—

ইউনিকর্ন। দেয়ালে দেয়ালে সোনার গিলটি করা বড় বড় ছবি। ভূতপূর্ব রাজাদের ছবি, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌এর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহদের। তাঁরা কি ভিখারীর বাচ্চাটাকে এই রাজকক্ষে দেখে কৌতুকের হাসি হাসছেন ?

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল, তার হিসাব টম রাখে নি। হঠাৎ তার গা ছমছম করে উঠল। রাজপুত্র তো এলেন না এখনও! এত দেরি তাঁর হবে কেন ? ছেঁড়া কাপড় পরে বাইরে গিয়েছেন, যত শীঘ্রই সম্ভব ফিরে আসাই তো তাঁর উচিত! এদিকে একা পড়ে টমের কী দশা হয়েছে, সেটা ভেবেও তো তাঁর চটপট চলে আসার দরকার ছিল!

আসেন নি রাজপুত্র, আসছেন না! অন্য কেউ যদি আসে এইবার ? টমকে দেখে নিশ্চয় কৈফিয়ত চাইবে হাজার রকম—"কে তুমি ? চোর নাকি তুমি ? তোমার কেন ফাঁসি হবে না, বলতে পার ?"

না, তা বলতে পারে না। টমের জবাবের ওপরেই যদি টমের জীবনমরণ নির্ভর করে, তা হলেও টম এমন কিছু বলতে পারবে না এই মুহূর্তে, যার দ্বারা তার নির্দোষিতা প্রমাণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাজপুত্র ? কোথায় গেলেন রাজপুত্র ? তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকা—এ তাঁর কী-রকম নিষ্ঠুর পরিহাস ?

যত সময় কাটে, তত টমের বুকের ভিতরটা আতঙ্কে ছুরুছুরু করে! বাইরে কোথাও ক্ষীণতম একটু শব্দ হলেই সে চমকে লাফিয়ে ওঠে—ওই বুঝি আসছে জল্লাদ, তাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে! ফাঁসির মঞ্চ টম দেখেছে। শহরের মাঝখানেই জায়গায় জায়গায় ফাঁসি হয় মাঝে মাঝে। হঠাৎ একদিন ভোর-বেলায় লোকে দেখতে পায় -যে কোন একটা চৌমাথায় রাতারাতি এক ফাঁসিকাঠ গজিয়ে উঠেছে। লোক জমে যায় মজা দেখবার

জন্যে। ফাঁসিকাঠের নীচে কাঠের মাচার ওপরে দেখা যায় হাত-পা-চোখ বাঁধা একটা মানুষকে। রাজকর্মচারি এসে ঘোষণা করেন—সে কে, কী অপরাধ সে করেছে, কে তার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন ইত্যাদি।

নিজেকে সে অপরাধীর স্থানে কল্পনা করে নিয়ে রাজপোশাকের ভেতরে ভেতরে গলগল করে ঘামতে থাকে টম ক্যান্টি।

হঠাৎ সে ভয়ানকভাবে চমকে ওঠে—খুট্ করে সামান্য একটু আওয়াজ, তার পরেই দরজা ধীরে ধীরে খুলে যায়। বাইরে থেকে আসবার সময় টম দেখে এসেছিল এক পাল বালকভৃত্য। টমেরই সমবয়সী। রেশমে ভেলভেটে সেজে বাইরের ঘরে বসে আছে, কখনও যদি যুবরাজ কোন আদেশ করেন, তাই পালন করে ধন্য হবে- এই প্রতীক্ষায়।

সেইরকমই প্রজাপতির মত চটকদার এক বালকভৃত্য দরজার ও । দাঁড়িয়ে একেবারে কোমর পর্যন্ত মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল টম ক্যান্টিকে. আর গলার স্বর অসম্ভব রকম মিহি করে বলল—"মহিমান্বিত প্রভু! রাজকুমারী লেডি জেন গ্রে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছেন।" এই বলেই সে অন্তর্ধান করল, এবং দ্বারপথে দেখা গেল এক সুন্দরী বালিকাকে, যার বসনভূষণের জৌলুস একমাত্র টমের এই মুহূর্তের বস্ত্রালংকারের জৌলুসের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

লেডি জেন গ্রে! টমের মনে পড়ল- স্বল্পকালের আলাপের মধ্যেই যুবরাজ তাকে দুটি বালিকার কথা বলেছিলেন—এক তাঁর ভগিনী রাজকুমারী এলিজাবেথ, এবং তাঁর আত্মীয়া লেডি জেন। এই অল্প বয়সেই তাঁরা লাটিনে গ্রীকে ফরাসী ভাষার বিদ্যায় স্বয়ং রাজপুত্রকেও ছা ড়িয়ে গিয়েছেন, অসাধারণ বুদ্ধিমতী এঁরা দুজনেই।

সেই লেডি জেন! এরকম অসামান্যা মেয়ে-যে টমের ছদ্মবেশ এক মুহূর্তেই ধরে ফেলবে, তাতে আর সন্দেহ কোথায়? সুতরাং ধরা

পড়ার চাইতে ধরা দেওয়া ভাল। ধরা দিয়ে মার্জনা ভিক্ষা ছাড়া আর উপায় কী? মার্জনা! দয়া!

আর ধরতে গেলে টমের তো কোন অপরাধই নেই এ-ব্যাপারে। অপরাধ যে নেই, তা তো যুবরাজই নিজের মুখে বললেন। লেডি জেনকে এখন শুধু অনুরোধ করা দরকার যে তিনি দয়া করে যুবরাজকে ডেকে দিন।

লেডি জেন বালিকাটি চঞ্চলা। দরজাও বন্ধ হল তাঁর পেছনে, তিনিও সমুখ পানে ছুটে এলেন তীরবেগে—"যুবরাজ! যুবরাজ! ভাই যুবরাজ!"

সহসা লেডি জেনের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। যুবরাজ তাঁর পায়ের তলায়! একেবারে জানু পেতে বসে পড়েছেন। কাতর নয়নে তাঁর পানে তাকিয়ে কাতরকণ্ঠে বলছেন—"মহিমান্বিতা রাজকন্যা! দীন টম ক্যান্টি আপনার শরণাগত, তাকে বাঁচান। তার কোন অপরাধ নেই। এখানে এসে প্রবেশ করা, যুবরাজের সাজসজ্জায় অঙ্গ ভূষিত করা—অপরাধ হিসাবে সাংঘাতিক হলেও এসব তার ইচ্ছাকৃত নয়। যুবরাজ জানেন সব। যুবরাজ একবার টম ক্যান্টির কথা জানালেই—"

আর বলবার সময় হল না। উদ্‌ভ্রান্তভাবে একবার টম ক্যান্টির দিকে তাকিয়ে দেখে ভীত, ত্রস্তভাবে রাজকন্যা তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে, তাঁর পিছনে আবার রুদ্ধ হল গৃহদ্বার।

আর টম ক্যান্টি? আর তার জীবনের আশা নেই! রাজকন্যার দয়া হল না! এইবার তাঁর মুখ থেকে সব খবর প্রচার হয়ে যাবে এই মুহূর্তে, খবর যাবে মহারাজের কাছে। মহারাজ অষ্টম হেনরি কোমল প্রকৃতির লোক নন, তা সবাই জানে—পত্রপাঠ তিনি জল্লাদকে পাঠিয়ে দেবেন—এই অনধিকার প্রবেশকারী ভিখারী ছেলেটাকে টেনে বার করে রাজপথের যে কোন জায়গায় ফাঁসিকাঠে লটকিয়ে

দেবার জন্যে। হায়! এখনও যদি যুবরাজ আসতেন! কোথায় গেলেন তিনি?

* * * *

খবর সত্যিই ছড়িয়ে পড়ল। যেভাবে ছড়িয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করেছিল টম ক্যান্টি, ঠিক সেভাবে নয় অবশ্য।

যেভাবে ছড়াল, তাতে ক্রোধের বদলে নৈরাশ্য এসে জুড়ে বসল প্রাসাদবাসীদের অন্তরে। মহলে মহলে, অলিন্দে অলিন্দে, দেখা দিতে লাগল দুইজন, চারজন বা ছয়জনের এক একটা সমাবেশ, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি, ফিসফিস পরামর্শ, তারপর মাথা-নাড়ানাড়ি—আর দু'হাত ঘুরিয়ে হতাশা প্রকাশ।

চলল এইরকম ঘণ্টাখানেক। দুইজনের সমাবেশে এখন দশ জন দেখা যাচ্ছে। মহার্ঘ বেশবাসে সজ্জিত লেডি এবং লর্ডেরা দেখা দিচ্ছেন চিন্তাকুল মুখে, প্রত্যেকের ভাব ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে অন্তরের চাপা উত্তেজনা। হবে না উত্তেজনা? রাজবংশের একমাত্র বংশধর ইংলণ্ডের ভাবী রাজ্যেশ্বর, তিনি যদি—

হঠাৎ একটা গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি গমগম করে উঠল প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে। ঘোষণা করছে সেই কণ্ঠ—"রাজার আদেশ! প্রাসাদবাসীরা সবাই রাজাদেশ-শ্রবণে অবহিত হোন। মহিমান্বিত প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ অসুস্থ হয়েছে—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে কেউ এই মিথ্যা কথা নিয়ে জল্পনায় রত হবেন, রাজরোষ তাঁকে বরণ করে নিতে হবে। সাবধান! সাবধান! সর্বশক্তিমান ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরির আদেশ। সবাই মনেপ্রাণে স্থির জানুন—যুবরাজের দেহ এবং মস্তিষ্ক দুইই ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।"

ঘোষকের কণ্ঠ নীরব হওয়ার আগেই অলিন্দের সেই ছোটোখাটো সমাবেশগুলি যেন জাদুমন্ত্রে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। অষ্টম হেনরি কোমল প্রকৃতির লোক নন, তা না জানে কে? যে কোন লর্ড বা

লেডির মস্তক তাঁর অঙ্গুলির এতটুকু হেলনে যেকোন মুহূর্তে ধূলায় লুটিয়ে পড়তে পারে। পড়ছেও অবিরত।

তার পরই প্রাসাদ অলিন্দে দেখা গেল যথাসম্ভব নিঃশব্দে বৃহৎ একদল রাজপুরুষের মৌন মিছিল। শুধু দলটাই বৃহৎ নয়, রাজপুরুষেরাও সবাই অতি-বৃহৎ ব্যক্তি। রাষ্ট্রের এক এক বিভাগের কর্ণধার এঁরা প্রত্যেকেই। এ দলে চ্যানসেলর আছেন, মার্শাল আছেন, আছেন মন্ত্রী, আছেন সেনাপতি। নীরবে তাঁরা মহারাজের মহল থেকে এসে যুবরাজের মহলের দিকে যাচ্ছেন। নিঃশব্দ তাঁদের গতি, নীরব তাঁদের রসনা, বিষণ্ণ তাঁদের বদন ইংলণ্ডের রাজা এবং রাজ্যের ওপরে যে একটা বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে, তা তাঁদের দিকে একবার চোখ মেলে তাকালেই বুঝতে পারা যায়।

মিছিল চলে গেল। প্রতি মহল থেকে ডজনে ডজনে উৎকণ্ঠিত চক্ষু তাকিয়ে রইল অলক্ষিতে—কখন মিছিল ফেরে, কীভাবে ফেরে। বেশীক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকতে হল না প্রাসাদবাসীদের, মিনিট দশেকের ভেতরেই ফিরে এল সেই মিছিল—তেমনি নিঃশব্দে, ততোধিক বিষণ্ণ বদনে! সেইভাবেই ফিরে এল, কেবল একটিমাত্র তফাত। মহার্ঘ ভূষায় সজ্জিত এক বালক এবার সেই মিছিলের কেন্দ্রস্থলে। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষদের অঙ্গে ভর দিয়ে সে শিথিলপদে হেঁটে আসছে. হেঁটে চলে যাচ্ছে মহারাজ অষ্টম হেনরির দরবারে।

ঘোষকেরা মাঝে মাঝে অনতি উচ্চ কণ্ঠে হেঁকে উঠছে, সর্বব্যাপী নীরবতা ভঙ্গ করে। হাঁকছে—"মহিমান্বিত যুবরাজ, প্রিন্স অব ওয়েলস্ এর সমুখ থেকে সরে যাও সবাই, পথ ছেড়ে সরে যাও সবাই।"

মহিমান্বিত যুবরাজই বটে! যুবরাজবেশী বালক ভালই জানে—সে আঁস্তাকুড় বস্তির বাসিন্দা টম ক্যাণ্টি ছাড়া আর কেউ নয়! ভালই জানে যে তার প্রকৃত পরিচয় অন্ততঃ কতক লোকে ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে, জানিয়ে দিয়েছে ওই চঞ্চলা জেন গ্রে মেয়েটাই। তা নইলে মহারাজ তাকে ডেকে পাঠাবেন কেন এত তাড়াতাড়ি?

নিশ্চয়ই তাই। নিশ্চয়ই দুঃসাহসী প্রতারকের যোগ্য সাজা দেবার জন্যেই মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে। সাজা আর কী, ফাঁসি ছাড়া এ অপরাধের দণ্ড আর কী হতে পারে? হায়, এখনও যদি যুবরাজ এসে পড়তেন!

সে একবার নিকটস্থ লর্ড মশাইদের ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল—"মহাশয়, যুবরাজ কোথায়, আপনারা জানেন কি?"

প্রশ্ন শুনে লর্ড মশাইয়ের মুখ হয়ে উঠল বিষণ্ণ করুণ, তিনি কেঁদে ফেলেন আর কি! নীরবে নতমুখে তিনি পথ চলতে লাগলেন। পার্শ্ববর্তী অন্য লর্ড মিষ্ট শান্ত স্বরে টমকে বলল- "যুবরাজ! আত্মবিস্মৃত হচ্ছেন কেন? যুবরাজ তো আপনিই!"

ব্যঙ্গ! টমের সন্দেহমাত্র নেই যে এই লর্ডেরা তাকে ব্যঙ্গ করছেন। তা নইলে, যাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাকে বলে কিনা-- "যুবরাজ তো আপনিই।" সব জেনেও যারা এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করতে পারে একটা ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে, তারা মানুষ, না দানব?

মনে বড় ব্যথা লাগল টমের। সে প্রতিজ্ঞা করল --মহারাজ ভিন্ন অন্য কারও সঙ্গে কোন কথাই সে কইবে না। এদের যখন ক্ষমতা নেই কিছু, মিছে কেন দৈন্য স্বীকার করা এদের কাছে?

অবশেষে মহারাজের মহল!

বিশাল স্বর্ণখচিত এক কাঠের দরজা। দুই ধারে দৈত্যাকার সব সৈনিক পুরুষ। কাঁধে তাদের রণকুঠার, কটিতে বিলম্বিত দীর্ঘ তরবারি। ইস্পাতের বর্ম ঝলমল করছে রুপোর মত। তারা নিঃশব্দে খুলে দিল সেই এক কাঠের দরজা। দুজন দুজন করে সেই মিছিলের লোকগুলো নিঃশব্দে প্রবেশ করল রাজার মহলে।

প্রবেশ করে আর দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায় ফ্রেমে আঁটা ছবির মত। নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। শুধুমাত্র টম দাঁড়িয়ে রইল কক্ষের মাঝখানে, আর তার পাশে দুজনমাত্র মহামান্য লর্ড।

টম মরবার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছে। আর মরবার জন্যে যে তৈরী, সে আর ভয় করবে কাকে? একটা মাত্র কাজ তার করবার আছে এই মুহূর্তে, জীবন রক্ষার জন্যে মহারাজের কাছে একটা আবেদন। সে নিরপরাধ, সুতরাং এ চেষ্টা করবার অধিকার তার আছে, এ চেষ্টা করাই তার কর্তব্য। সেই কারণেই সে আবেদনটা করবে। তা নইলে, ফলাফল যে কী হবে এ আবেদনের, তা সে ভালই জানে। ফাঁসি তার হবেই।

মরতে সে তৈরী। তবু আবেদনটা সে করবে। তারই জন্যে সে মহারাজকে খুঁজছে। মহারাজ অষ্টম হেনরিকে সে দেখে নি কখনও দেখলেও চিনবে না নিশ্চয়। হয়ত সেই না-চেনাটাই হবে আর এক দফা অপরাধ। হোক! ফাঁসির চাইতে গুরুতর তো আর কিছু হতে পারে না!

টমের জানা নেই—ফাঁসির চেয়ে গুরু দণ্ডও আছে ইংলণ্ডে। তবে সে কথা এখন থাকুক।

এদিকে ওদিকে চাইছে বেচারা টম। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল দূরবর্তী এক কোণে সংকীর্ণ একটি শয্যার দিকে। সেই শয্যাতে শুয়ে আছেন অতি মোটা, খাটো খাটো দাড়িওয়ালা একটি মানুষ, যাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেই সাহস হচ্ছে না কারও, এমন কি টমের দুইপাশে দাঁড়ানো শ্রেষ্ঠ লর্ডযুগলেরও নয়।

মোটা লোকটির পরিধানে মহামূল্য বসন, কিন্তু সে বসন বেশ একটু পুরানো, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া বেরিয়ে পড়েছে যেন। মোটা একটা পাশ-বালিশের ওপরে একখানি পা তুলে দিয়ে তিনি যেন যন্ত্রণার লাঘব করতে চাইছেন একটু। বৃথা চেষ্টা। বাত-ব্যাধির দুরন্ত আক্রমণ তাঁর থলথলে মুখখানাকে বিকৃত করে তুলছে বার বার, দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে তিনি নিজেকে সংযত রাখছেন, মুখ দিয়ে বেরুতে দিচ্ছেন না এতটুকুও কাতরোক্তি।

এই বাতে পঙ্গু মোটা মানুষটিই মহামান্য নৃপতি অষ্টম হেনরি—

গোটা ইংলণ্ডের বিভীষিকার কারণ, গোটা ইওরোপের বিতৃষ্ণার পাত্র।

টম গিয়ে কক্ষতলে দাঁড়াতেই রুগ্‌ণ রাজার কঠোর মুখমণ্ডলে একটা অনির্বচনীয় কোমলতার আভাস ফুটে উঠল। তিনি কষ্টে হাত তুলে হাতছানি দিয়ে টমকে কাছে ডাকলেন। টম তো সাহসই পায় না রাজার দিকে অগ্রসর হওয়ার। লর্ডেরা কানে কানে বললেন—"মহারাজ যে ডাকছেন! যুবরাজ এগিয়ে যান. করছেন কী?"

মহারাজ! মহারাজ! এঁর মুখ থেকেই টম মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনতে পাবে এক্ষুনি। তবু উনি ডাকছেন যখন—আবেদন নিবেদন যদি কিছু করতে হয় তো এক্ষুনি। আর দেরি করল না টম, করল না কোন সংকোচ: দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে বসে পড়ল রাজার শয্যাপার্শ্বে।

রাজা তাকে কাছে টেনে নিলেন। দুই হাতে তার মুখখানি উঁচু করে ধরে সতৃষ্ণনয়নে তাকাতে লাগলেন সেই মুখের পানে। কী যেন তিনি খুঁজছেন সেই মুখের অবয়বে, সেই চোখের অভিব্যক্তিতে।

রাজা তাকিয়ে আছেন নীরবে নয়। রাজার মুখ থেকে অর্ধস্ফুট আদরের কাকলী শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—"আমার সোনার প্রিন্স, আমার আদরের বাবা-মণি! এসব কী দুষ্টুমি শুরু করেছ? বুড়ো বাবাটাকে ভয় দেখাতে চাইছ, নয়? দেখ, তাকিয়ে দেখ আমার দিকে। আমায় তো চিনতে পারছ, কেমন?"

"আপনি তো মহিমান্বিত মহারাজ, আপনাকে কে না চেনে?"—উত্তর দেয় টম। পাদরি অ্যানড্রুর প্রসাদে জমকালো ভাষার ব্যবহারে সে অক্ষম নয়।

"মহিমান্বিত মহারাজ!"—রাজা যেন আধাআধি খুশী—"তা বটে, তা বটে। কিন্তু সে তো অন্য লোকের কাছে। তোমার কাছেও কি আমি শুধু রাজা ছাড়া আর কিছু নই? দেখ, ভাল

করে চেয়ে দেখ—আমি তোমার স্নেহময় পিতা, চিনতে পারছ তো আমাকে ?"

"আমার পিতা ?' টম ভয়ে কাঁপতে থাকে—"এমন কথা চিন্তা করবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি বস্তির ছেলে, নরদমায় গড়াগড়ি দিয়ে দিয়ে এতখানি বড় হয়ে উঠেছি, আপনাকে পিতা বলে ভাবব—এমন দুর্মতি যেন আমার না হয়।"

রাজার মুখের ওপর কে যেন সপাং করে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিল। তিনি সন্ত্রস্তভাবে একবার উপস্থিত লর্ডদের দিকে তাকিয়ে নিলেন—রাজপুত্রের উন্মত্ততার এই সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে তাদের মনে কী প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়েছে, সেইটি বুঝবার জন্য।

কিন্তু বোঝা গেল না কিছু, কারণ লর্ডেরা সাবধানে মাথা নীচু করে আছেন। রাজার সঙ্গে চোখোচোখি না হয় কোনমতে! কারও উপরে রাজার এমন সন্দেহ যদি হয় যে সেই ব্যক্তি রাজপুত্রের এই আকস্মিক দুর্ভাগ্যে এতটুকুও খুশী হয়েছে, তা হলে বর্তমান অবস্থায় তার জীবনের দাম এক ফার্দিংও নয়।

রাজা কোন উত্তর দিচ্ছেন না দেখে টম বুঝি সাহস পেল একটু। সে সকাতরে বলে উঠল—"প্রভু! রাজরাজেশ্বর! অধমের আবেদনটি শুনুন দয়া করে। আমি রাজপুত্র নই, এ রাজপ্রাসাদে আজই আমি প্রথম প্রবেশ করেছি। তাও নিজের ইচ্ছায় নয়। এ অবস্থায় আমার মৃত্যুদণ্ড কেন হবে ?"

তার কাতরতা দেখে রাজার অন্তর বেদনায় আতুর হয়ে উঠল। উন্মাদ পুত্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন—"সে কি বৎস! কে তোমার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে? এমন শক্তিমান পৃথিবীতে কেউ নেই!"

টম উল্লাসে লাফিয়ে উঠল—"তবে আমায় মরতে হবে না? জয় হোক মহারাজের!" তারপর উপস্থিত লর্ডদের দিকে তাকিয়ে বলল—"আপনারা সবাই তো শুনলেন, মহারাজ নিজমুখে বলছেন

—আমায় মরতে হবে না।" তারপর আবার রাজার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করল—"মহারাজ! তা হলে আমি যাই।"

রাজা বিষণ্ণ হয়ে বললেন—"যেতে যদি তোমার ইচ্ছা হয় যাবে বইকি বাবা! তবে, থাকো না একটু! বুড়ো বাবার কাছে একটু-খানি বসো না! আচ্ছা- "

হঠাৎ রাজা সভাসদ্দের দিকে তাকিয়ে বললেন—"যুবরাজের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা সেটা কি শুধু মানুষ চিনবার পক্ষেই ঘটল? না, লেখাপড়া-টড়া সব কিছুর ওপরেই ছায়া পড়েছে তার? দেখাই যাক পরীক্ষা করে।"—এই বলে তিনি লাটিন ভাষায় একটা প্রশ্ন করে বসলেন টমকে।

পাদরি অ্যান্ড্রুর প্রসাদে ও-ভাষা একটু জানে টম, রাজার মত চোস্ত লাটিনে না হোক—চলনসই লাটিনে সে রাজার প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হল।

রাজার আনন্দ দেখে কে! একটা সংকট কাটিয়ে উঠেছেন যেন! খুব উল্লাস করে লর্ডদের সম্বোধন করলেন "দেখছ তোমরা? প্রিন্স আমার লাটিন ভোলে নি! ওর জবাবের ভাষাটা অবশ্য আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল! ও যা শিখেছে, সে বিদ্যার অনুযায়ী হয় নি উত্তরটা! তা হোক, অসুস্থ দেহ-মনের কথা ভেবে দেখলে যুবরাজকে ওর জন্য দায়ী করা যায় না।"

সভাসদ্গণ সাগ্রহে সায় দিল একথায়।

তখন উৎসাহিত রাজা প্রস্তাব করলেন—"এবারে ফরাসী ভাষায় কথা কওয়া যাক রাজকুমারের সঙ্গে। ও-ভাষা তো ওর জন্ম থেকে ও শিখছে!"

কিন্তু হায়! রাজার মুখে ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন শুনে টম ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, এবং অবশেষে জবাব দিল ইংরেজীতেই—"আমি তো জানি না ওটা!"

রাজা হতাশ হয়ে নেতিয়ে পড়লেন! তারপর আর একবার শেষ পরীক্ষা—এবার প্রশ্ন গ্রীক ভাষায়! সমানই দুরবস্থা টমের। সভাসদেরা সাহস করে মাথা তোলে না কেউ। রাজা অবসন্নভাবে বিছানায় পড়ে আছেন।

কিন্তু অষ্টম হেনরি দমবার পাত্র নন—হুংকার করে উঠলেন—"হার্টফোর্ড?"

টমের পাশে যে দুইজন শ্রেষ্ঠ লর্ড দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদেরই একজন এগিয়ে গিয়ে রাজার পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন।

"অতিরিক্ত পড়াশুনা করিয়ে করিয়ে প্রিন্সের মাথাটা খারাপ করে দিয়েছ তোমরা। আর পড়াশুনা নয়। ওসব শিকেয় তুলে রেখে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে কিছুদিন কাটাতে দাও রাজপুত্রকে। খেলাধুলো, নাচগান, রাজকুমারী এলিজাবেথ আর জেন এদের সাহচর্য—এছাড়া আর কিছু নয়! বুঝেছ?"

হার্টফোর্ড ঝটিতি উত্তর দেন—"বুঝেছি প্রভু।"

টম হতাশ হয়ে পড়ে। ফাঁসি তার হবে না, তা বুঝতে পারছে। কিন্তু এই সোনার খাঁচা থেকে মুক্তি লাভের ক্ষীণতম আশাও তো চোখে পড়ে না। এ যে পাকাপাকিভাবেই তাকে আটক করার বন্দোবস্ত হচ্ছে সে কি তাহলে তার মাকে আর দেখতে পাবে না? দেখতে পাবে না বেটি আর ন্যানকে?

একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। রাজা হয়ত ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু সে ভয় করলে তো চলছে না। সে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল "আমি কি তা হলে যেতে পারি?"

প্রশ্নটার যে অন্য অর্থ হতে পারে, বুদ্ধিহত বালকের সেটা মাথায় আসে নি! রাজা বললেন- "যাবে? তা যাও! আনন্দ কর গিয়ে। বেশ ফুর্তিতে থাক গে যাও। অসুখবিসুখকে কাছে ঘেঁষতে দিও না। আর হয় যদি অসুখ, চিন্তা কী। তোমার বাবা কি নেই? আজই আমি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের ডেকে এনে তোমাকে সুস্থ করে

তোলার ব্যবস্থা করছি! হ্যাঁ যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে। আমারও বিশ্রামের দরকার বোধ করছি। পরে আবার ডাকাব এখন তোমায়। লর্ড হার্টফোর্ড! নিয়ে যান রাজপুত্রকে।"

বেচারা টম আর দ্বিরুক্তি করার সুযোগ পেল না, সে-সুযোগ হার্টফোর্ড দিলেনও না তাকে। উপস্থিত লর্ডদের বৃহৎ এক অংশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি টম ক্যান্টির চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন এবং চলতে শুরু করলেন কক্ষদ্বারের দিকে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক টমকেও চলতে শুরু করতেই হল।

তখন মহারাজ অষ্টম হেনরি মাথা তুলে তাকালেন অবশিষ্ট লর্ডদের পানে চোখে তাঁর আগুনের ঝলক। হৃৎকম্প শুরু হল বেচারা লর্ডদের। না জানি কার গর্দানা যায় এইবারে। কোন অপরাধ অবশ্য কেউ করে নি এই মুহূর্তে। কিন্তু অপরাধ না হলেও গর্দানা যাওয়ার আটক নেই, পরম ন্যায়নিষ্ঠ মহারাজ অষ্টম হেনরির দরবারে।

রাজার কণ্ঠ বেজে উঠল—সে যেন বর্ষার মেঘডম্বর।

"অভিজাত লর্ড মশাইদের একটা কথা বলবার আছে আমার। আমার এই ছেলে—ইংলণ্ডের একমাত্র রাজবংশধর—জানি না ভগবানের কোন্ ইঙ্গিতে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ সুস্থতা না থাকলেই তাকে আমরা উন্মাদ বলি। সে হিসাবে প্রিন্স এডোয়ার্ড আজ উন্মাদ কিন্তু উন্মাদ হয়েছে তো হয়েছে কী? হাজার বার সে উন্মাদ হোক, এর চেয়ে হাজার গুণ বেশী উন্মাদ হোক—তবু কেউ যেন না ভোলে, হ্যাঁ, এইটেই আমার আসল বলবার কথা—কেউ যেন এক মুহূর্তের জন্যও না ভোলে যে ওই উন্মাদ রাজপুত্রই ইংলণ্ডের সিংহাসনের একমাত্র এবং অবিসম্বাদী উত্তরাধিকারী। যে ভুলবে তার ভাগ্যে কী আছে—আশা করি তা আর আমায় বলে দিতে হবে না।"

কয়েকজন বিড়বিড় করে বলল—"না, আমরা জানি তা।"

কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ সেই বিশাল রাজকক্ষে। তারপর আবার সেই গুরুগুরু গর্জন রাজার কণ্ঠ থেকে—'হ্যাঁ, প্রিন্স এডোয়ার্ডই যে সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে যাতে কারও মনে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমি অচিরেই তাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করব, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ রূপে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে মুকুট পরিয়ে দেব যতশীঘ্র সম্ভব। লর্ড চ্যান্সেলর! তুমি এর ব্যবস্থা কর শীঘ্র'

লর্ড চ্যান্সেলর অগ্রসর হলেন এইবার যথারীতি নতজানু হয়ে বসলেন গিয়ে রাজার শয্যাপার্শ্বে—তারপর সবিনয়ে নিবেদন করলেন—

"রাজার এ আদেশ অলঙ্ঘ্য তো বটেই, তা ছাড়া আমরা অশেষ আনন্দও পেয়েছি এই আদেশ শ্রবণ করে। মহামান্য প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত হবেন, এর চেয়ে সুসংবাদ ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। আমি এবং আমার সহকর্মীরা এক্ষুনি এই শুভকার্যের অতি-ত্বরিত অনুষ্ঠানের জন্য ব্রতী হব। একটা কেবল অসুবিধা দেখা যাচ্ছে প্রভু, যৌবরাজ্যে অভিষেক করবার জন্য আর্ল মার্শালের উপস্থিতি প্রয়োজন। তাঁরই হাত দিয়ে কতকগুলো পবিত্র কর্ম করানোর রীতি আছে, তা সর্বজ্ঞ মহারাজের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু কথা এই যে—ইংলণ্ডের বর্তমান আর্ল মার্শাল আছেন কারাগারে আবদ্ধ হয়ে।"

অদূরদর্শী চ্যান্সেলর কি এই সুযোগে পরোক্ষে বন্ধু আর্ল মার্শালের মুক্তির জন্য একটা সুপারিশ করতে যাচ্ছিলেন? কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর এবং তাঁর বন্ধুর—হিতে বিপরীত হয়। ওই অবাঞ্ছিত লোকটির নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্র রাজা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

"আর্ল মার্শাল? সেই নরফোক? তাকে দিয়ে আমার পুত্রের অভিষেকে পবিত্র কর্ম করাবে? অষ্টম হেনরী বেঁচে থাকতে নয়। তবে হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করে দিয়েছ তুমি! আমার ওই পরম শত্রুকে

আর বাঁচতে দেওয়ার কোন মানে হয় না। ওর প্রাণদণ্ডের আদেশটা পার্লামেন্টকে দিয়ে পাস করিয়ে নাও, তারপর সেই আদেশনামায় সীলমোহর করে—হ্যাঁ, কাল প্রত্যুষেই নরফোকের ডিউকের ছিন্নমুণ্ড আমাকে দেখাবে, যাও।"

"কাল সকালেই?" চ্যান্সেলরের নিজেরই অজ্ঞাতে যেন এই উক্তিটা বেরিয়ে পড়ল তাঁর মুখ থেকে।

"নিশ্চয়ই! কাল সকালেই! তার শিরশ্ছেদটা হয়ে গেলেই আমি নতুন একজন আর্ল মার্শাল নিয়োগ করতে পারব, এবং তারই হাত দিয়ে এডোয়ার্ডের অভিষেকের সব কাজ করিয়ে নিতে পারব। নরফোক? তার মত অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহী আমার পুত্রের মাথায় মুকুট পরাবে, তাই আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, ভেবেছ নাকি? যাও, পার্লামেন্টকে বলে পাঠাও, এবং সীল নিয়ে তৈরী হয়ে থাক। নরফোক টাওয়ারেই আটক রয়েছে, তার মাথাটা কেটে আনার জন্য বেশী সময় তুমি পাবে না।"

"তাহলে সীলটা আমায় দিয়ে দেওয়া হোক, প্রভু!"

"সীল? তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে সীল থাকে?"

"আমার কাছেই থাকে বটে, কিন্তু নিজের হাতে নরফোকের মৃত্যুদণ্ডে মোহর করবেন বলে আমার কাছ থেকে প্রভু সেটি চেয়ে নিয়েছিলেন।"

"চেয়ে নিয়েছিলাম? তা হতে পারে। এই সাংঘাতিক বাতের অসুখ হয়ত আমার মস্তিষ্কটাকেও আক্রমণ করেছে, তা নইলে এরকম একটা দরকারী কথা আমি ভুলে গেলাম কেমন করে?"

হেনরি ক্ষণকাল নীরব। সীল কোথায় রেখেছেন, সেইটিই মনে করবার চেষ্টা করছেন নিশ্চয়। নাঃ, কিছুতেই মনে পড়ে না। রাজা ভয়ানক রেগে উঠছেন নিজেরই ওপর। কিন্তু নিজের ওপর রাগ করে নিজের ক্ষতি করার পাত্র হেনরি নন, ক্ষতি হয়ত হবে ওই চ্যান্সেলরের। সে বেচারা তো থরহরি কম্পিত।

ভদ্রলোককে বাঁচালেন হার্টফোর্ড। তিনি টম ক্যান্টিকে যুবরাজের মহলে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। এখন চ্যান্সেলরের বিপন্ন অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি নতজানু হয়ে বললেন—"ধৃষ্টতা মার্জনা হয়ত বলি, মহারাজ, সীলটি আপনি কয়েকদিন আগে যুব-রাজের হাতে দিয়েছিলেন, যত্ন করে রাখবার জন্য।"

"ঠিক, ঠিক, ঠিক!" রাজা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—"ঠিক বলেছ তুমি। মনে পড়েছে আমার! যাও, তুমিই গিয়ে প্রিন্সের কাছ থেকে সীলটি চেয়ে আন আমার নাম করে।"

হার্টফোর্ড চলে গেলেন, ফিরেও এলেন। ফিরে এলেন বিষণ্ণ বদনে। এসে নিবেদন করলেন—"বড়ই দুর্ভাগ্য, যুবরাজ সীলের কথা কিছুই মনে করতে পারছেন না।"

রাজার মুখে এবার আর ক্রোধের চিহ্ন দেখা গেল না, তার পরিবর্তে দুঃখ এবং করুণা ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে—"যাক, যাক, বেচারি পুত্র আমার। অসুস্থ মস্তিষ্ককে আর বিব্রত করে কাজ নেই। ওহে চ্যান্সেলর, ছোট সীলটা আছে না কোষাগারে? সেইটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও আপাততঃ। সেটাও তো সীল। সেটার মোহরও আইনতঃ সিদ্ধ।"

৪

ওদিকে লর্ডেরা টমকে নিয়ে তুলেছেন প্রিন্স অব্ ওয়েলসের নিজস্ব মহলে, যেখান থেকে এই কিছুক্ষণ আগেই তাকে রাজদর্শনে যাত্রা করতে হয়েছিল। বেরুবার সময়ে সে প্রতিমুহূর্তে প্রাণদণ্ডের আশঙ্কায় অধীর হচ্ছিল। ফিরে আসার পর সে আশঙ্কাটা আর নেই বটে, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য তো মোটেই অনুভব করছে না! কী বেফাঁস কথা সে বলে বসে, কোন্ চোরাবালিতে পা তার ডুবে যায় তার অজান্তে—এই দুশ্চিন্তা তাকে ক্রমাগতই দগ্ধাচ্ছে।

কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে যাচ্ছে। কী বিরাট মহল প্রিন্স অব্ ওয়েলসের অর্থাৎ টম ক্যান্টির। আঁস্তাকুড় বস্তির ভাঙ্গা বাড়ির চারতলাতে ছোট্ট খুপরির মেঝেতে পচা খড়ের বিছানার কথা মনে পড়ে যায় ওর। সে হাসবে কি কাঁদবে, বুঝতে পারে না হঠাৎ।

এক সুরম্য দরবার-ঘরে এনে টমকে ঢোকাল লর্ডেরা। সোনালী চাঁদোয়ার নীচে প্রায় সিংহাসনেরই মত দেখতে এক জমকালো সুখাসনের দিকে টমকে নিয়ে গেলেন লর্ড হার্টফোর্ড। টমকে বসতে হবে এইখানে? ওর যে ভয় করছে! না, ভয় ঠিক নয়, সংকোচ! এই বয়স্ক লোকেরা, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষেরা থাকবেন দাঁড়িয়ে, আর সে কিনা একা একা বসবে? সে মৃদুস্বরে বলল—"আপনারাও বসুন।"

লর্ডেরা এ আমন্ত্রণে সাড়া দিতে দ্বিধাবোধ করলেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই। যুবরাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করার প্রথা নেই। প্রথাবিরুদ্ধ কাজ করলে বিপদের আশঙ্কা আছে। মহা-রাজের কানে যদি কথাটা যায়—কী না বিপদ ঘটতে পারে? মহা-রাজ জিজ্ঞাসা করবেন—"যুবরাজ না হয় পাগল হয়েছেন, তোমরা

তো পাগল হও নি ? তোমরা কী বলে এমন মহাপাপ করলে তখন তো আর উত্তর দেওয়ার কিছু থাকবে না!

তাদের দ্বিধার ভাবটা বুঝলেন হার্টফোর্ড। মৃদুকণ্ঠে তিনি টমকে বললেন—"ওঁদের আর অনুরোধ করবেন না যুবরাজ। আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণ করা ওঁদের পক্ষে উচিত নয়।"

টম একাই অগত্যা আসন গ্রহণ করল। লর্ডেরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন মুখমণ্ডলকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে।

এলেন লর্ড সেণ্টজন। রাজার কাছ থেকে বিশেষ বার্তা নিয়ে ইনি এসেছেন। যুবরাজকে অভিবাদন করে তিনি বললেন—"মহারাজ তাঁর প্রিয় পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। তাঁর একটি উপদেশ আছে। আপনার এই অসুস্থতার কথা নিজেও ভুলে থাকবার চেষ্টা করুন, অন্য লোককেও যথাসম্ভব কম জানতে দিন। কোন বিশেষ কথা বা প্রথা মনে যদি না পড়ে, লর্ড হার্টফোর্ড রয়েছেন, আপনার দাসসেবক আমি রয়েছি, আমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই আমরা বলে দেব। যতটা মনে করতে পারেন, মনে করবেন। যেটা কিছুতেই মনে করতে পারবেন না, সেটাও মনে আছে বলে ভান করবেন। আজ রাত্রে গিল্ডহলে* লণ্ডনের নাগরিকেরা আপনার সংবর্ধনার আয়োজন করছেন, আপনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের আয়োজনকে সার্থক করবেন বলে কথা আছে —এটি আপনার স্মরণ হচ্ছে তো ?"

জলে মজ্জমান ব্যক্তির মত হাঁইফাঁই করে উঠল টম। গিল্ড হলে সংবর্ধনা ? টম ক্যান্টিকে ? সে কি ?

হার্টফোর্ড এগিয়ে এলেন তার সাহায্যে—"এই অসুস্থতা ! এই জন্যেই আপনি হয়ত মনে করতে পারছেন না কথাটা। দুই মাস হয়ে গেল—এ সম্বন্ধে পাকা কথা হয়ে গিয়েছে। মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন . . তাঁর পক্ষ থেকে আপনি যুবরাজ গিল্ড হলে উপনীত

---

*লণ্ডনের পৌরসভা।

হয়ে সংবর্ধনা গ্রহণ করবেন। দেশবাসীর রাজভক্তিতে সাড়া দেওয়াও তো রাজার কর্তব্য! এখন কি কথাটা আপনার মনে পড়ছে যুবরাজ?"

টম ক্যান্টি নির্বোধ নয়। ইঙ্গিত বুঝতে পারে। সে একটুখানি লজ্জার অভিনয় করে বলল—"বড়ই দুঃখ পাচ্ছি, এমন দরকারী কথাটা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বইকি! গিল্ড হলে যাওয়ার কথা তো? ভোজ আছে সেখানে। ঠিক। মনে পড়ছে বইকি!"

টম নিজের মনে নিজেকেই তারিফ করল। হার্টফোর্ডও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। উন্মাদ রাজপুত্রকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার তাঁর ওপরে পড়ে অবধি বেচারী লর্ডের আর শান্তি নেই।

এইবার টম একটা কাজ করল বুদ্ধিমানের মত! বলল— "আপনারা যদি বলেন, আমি একটু বিশ্রাম করি গিয়ে।"

হার্টফোর্ড মাথা নুইয়ে বললেন—"যুবরাজই প্রভু, যুবরাজের আদেশ অবশ্যই আমরা গ্রহণ করব। আর বিশ্রাম করা আপনার দরকারও। রাত্রের ওই উৎসব খুব আনন্দের হলেও ওতে পরিশ্রম অনেক। লর্ড অব্ দি চেম্বারকে ডাকুন কেউ, শয্যাগৃহের অধ্যক্ষকে।"

আহ্বানমাত্র শয্যাগৃহের মাননীয় অধ্যক্ষ, গণ্যমান্য দর্শনধারী এক লর্ড এসে পড়লেন। তিনি টম ক্যান্টিকে নিয়ে চললেন কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে শয্যাগৃহের দিকে। অধিকাংশ লর্ডই সৌজন্যের খাতিরে তার অনুগমন করল। টম শয্যাগ্রহণ করলে, তার অনুমতি নিয়ে তারা নিজেরা বিশ্রামের জন্য যেতে পারলো। কক্ষমধ্যে রইলেন শুধু দুইজন—লর্ড হার্টফোর্ড ও লর্ড সেন্টজন। দুইজনই দুইজনের দিকে তাকান। একটা কী যেন কথা তাঁরা আলোচনা করতে চান। কিন্তু কেউই প্রথমে মনের কথা প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছেন না। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছেন, এইবার বোধহয় বন্ধুর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়বে।

বেরিয়ে পড়ল অবশেষে। সেণ্টজন আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। হার্টফোর্ডের অতি নিকটে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন—"মাই লর্ড! একটা কথা বলতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন, এবং যদি কথাটা গোপন রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।"

হার্টফোর্ড জানেন কী বলতে চাইছেন তাঁর বন্ধু। তবু কিছু না বোঝার ভান করে তিনি বললেন—"মনেই বা করব কেন, আর গোপনই বা রাখব না কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, যা বলতে চান।"

সেণ্টজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হার্টফোর্ডের দিকে—"আমি বলছি মহামান্য যুবরাজের এই আকস্মিক ব্যাধিটার কথা। খুবই আশ্চর্য, নয়?"

হার্টফোর্ড বিরস কণ্ঠে বললেন—"ব্যাধি হওয়া আর আশ্চর্য কি? ও তো যে কোন মুহূর্তে যেকোন লোকের হতে পারে।"

"এইরকম ব্যাধি?" জোর দিয়ে বলে ওঠেন সেণ্টজন—"এরকম ব্যাধিও লোকের হয়, যার দরুন লোকে নিজের বাপকে চিনতে পারে না? যার দরুন চিরদিনের অভ্যস্ত নিয়মকানুন লোকে বেমালুম ভুলে যায়? যার দরুন লাটিন ভাষাটাই একটু আধটু মনে থাকে, গ্রীক আর ফ্রেঞ্চ বিলকুল মুছে যায় স্মৃতি থেকে? না মাই লর্ড, আপনার যদি এরকম ব্যাধির কথা জানা থাকে, সে আলাদা কথা। নিজের তরফ থেকে আমি বলব যে আমি এরকম কোন ব্যাধির কথা ইহজন্মে শুনি নাই।"

হার্টফোর্ড গম্ভীর হয়ে বললেন—"বন্ধু, নিজেকে সংযত করুন। এঘরে অন্য লোক নেই, আর আমিও কিছু বলতে যাব না কাউকে। কিন্তু আপনি কি একবারও ভেবে দেখেন নি যে আপনার পক্ষে এরকম কথাবার্তা বলা নিরাপদ হচ্ছে না? আমার কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু অন্য লোকে যদি এর ভেতর রাজদ্রোহের গন্ধ পায়, আপনি কি তাকে খুব বেশী দোষী করতে পারবেন?"

লর্ড সেণ্টজন কেঁপে উঠলেন একেবারে। তাইতো! এ তিনি কী করে বসেছেন? তাঁর কথার তো একটাই অর্থ হতে পারে! সে অর্থ এই যে, বর্তমান মুহূর্তে প্রিন্স অব ওয়েলস্ বলে যাঁকে চালানো হচ্ছে, তিনি সত্যিই প্রিন্স অব ওয়েলস্ কি না, সেই বিষয়েই সেণ্টজনের সন্দেহ রয়েছে! এবং এই সন্দেহের কথাটি যদি মহারাজ অষ্টম হেনরীর কানে কেউ দয়া করে তুলে দেয়—তবে কী না অনর্থ ঘটতে পারে? ইংলণ্ডের সব চাইতে পরাক্রান্ত লর্ড, আর্ল মার্শাল নরফোক, তিনিই কারারুদ্ধ রয়েছেন আজ প্রায় পক্ষকাল, তাঁর পরমায়ু বোধ হয় শেষ হল বলে। আর সেণ্টজন? নরফোকের তুলনায় তিনি কী? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!

সেণ্টজন দুখানা হাত জড়িয়ে ধরলেন হার্টফোর্ডের—"মাই লর্ড! মাই লর্ড! আমি সেরকম কিছু ভেবে একথা বলিনি। না না, সে কি কথা! ওরকম কোন সন্দেহ কি কোন বুদ্ধিমান লোকের হতে পারে? প্রিন্স সত্যিই প্রিন্স নন? যীশু কহো! এও কি একটা কথা হল? না না, মাই লর্ড, ওরকম কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কথাটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারি নি হয়ত, তাই আপনি ভুল বুঝেছেন আমাকে। না না, আপনি ওরকম সন্দেহ করবেন না। আপনাকে আমি সর্বান্তঃকরণে বলছি—উনিই যে আমাদের প্রিন্স অব ওয়েলস্, তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। আপনি বিশ্বাস করলেন তো আমার কথা? আপনাকে কিন্তু কথা দিতে হবে বন্ধু, যে কাকপক্ষীকে আপনি এসম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না। বললে আমার সর্বনাশ হবে—তা আপনিও জানেন আমিও জানি। বলুন আপনি যে আমার সর্বনাশ আপনি করবেন না।"

"না না, আমি কিছুই বলব না কাউকে।"—এই বলে হার্টফোর্ড আশ্বস্ত করলেন সেণ্টজনকে। সেণ্টজন আশ্বাস পেয়ে বিদায় হলেন বটে, কিন্তু হার্টফোর্ড নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। প্রিন্স অব

ওয়েলস্ হলেন গিয়ে হার্টফোর্ডের ভাগিনেয়। সেই প্রিন্স সত্যিকারের প্রিন্স কিনা, এতে বর্তমান অবস্থায় কারও কারও সন্দেহ জাগতে পারে বই কি! কিন্তু জাগতে দেওয়া হবে না! এরকম সন্দেহ যদি জাগে, তার অর্থ হবে রাষ্ট্রবিপ্লব, সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহবিবাদ। উঃ, গৃহবিবাদের দীর্ঘ অধ্যায়—এই সবে কয়েক বৎসর আগে পার হয়ে এসেছে এই হতভাগা ইংলণ্ড, আবার যদি সেইরকম আর একটা অধ্যায়ের সূচনা হয়? না না, এই প্রিন্সই প্রিন্স—এইটি প্রমাণ করবার জন্য মিথ্যাকেও সত্য বলে জাহির করতে হবে, যদি প্রয়োজন হয়।

সেইদিনই রাত্রি নয়টায় রাজপ্রাসাদ থেকে মিছিল বেরুলো টম ক্যাণ্টিকে নিয়ে। নদীপথে পৌরসভায় যাবে এই মিছিল লর্ড মেয়রের নিমন্ত্রণ করবার জন্য। নদীর জলে অসংখ্য বজরা, তাদের সঙ্গে ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা—দাঁড়ি-মাঝিরা বসেছে ওই ডিঙ্গিতে। অপূর্ব সজ্জা সে সব বজরার। পতাকার ঝালরে আলো আর ফুলের মালায় প্রত্যেকখানায় যেন এক একটি ঝলমল রামধনু সেজেছে।

রাজপ্রাসাদের পিছন দিক থেকে অতি বিশাল সোপানশ্রেণী নেমে এসেছে টেমস নদীর কূল পর্যন্ত। সেই সোপানের ওপর একটা বৃহৎ সেনাদলের স্থান সংকুলান হয়ে যেতে পারে অতি অনায়াসে। সেনাদল না হোক, অতি বৃহৎ একটি ভিড় ওই সোপানের ধাপে ধাপে আজ জমায়েত হয়েছে। সে ভিড়ের ভিতর লাল পোশাক পরা ফরাসী অভিজাতেরা আছেন, সাদা পোশাক পরা স্পেনিশ রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর সহকারীরা রয়েছেন, রয়েছেন নীল পোশাক পরা নেদারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের মুখপাত্রেরা।

একশোটা কামান গর্জন হল দুর্গ থেকে। আগে আগে ডিউক সোমারসেট এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মাথায়, তাঁর পশ্চাতে প্রিন্স অব ওয়েলস্। আজই এই কতক্ষণ আগে লর্ড হার্টফোর্ড ওই তুনন

উপাধি লাভ করেছেন। প্রিন্স উন্মাদ হয়ে যাওয়াতে তাঁর খবরদারির ভার পড়ল তাঁরই পরম আত্মীয় ওই হার্টফোর্ডের ওপরে। সেইজন্যই তড়িঘড়ি এই উপাধিবর্ষণ এবং পুরস্কার।

সোমারসেট এসেই একপাশে সরে দাঁড়ালেন, যাতে সোপানশিখরে দণ্ডায়মান যুবরাজের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দে আশ মিটিয়ে দর্শন করতে পারে। জ্যোতির্ময়ই বটে! হীরায়, মণি-মাণিক্যে, মাথার টুপি থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত ঝলমল করছে। সিল্ক, ভেলভেট, সাটিনে সোনালী জরি, সোনার বুটি ঝকমক ঝকমক করছে ক্রমাগত। হাত নড়ছে—এক ঝলক আলো। পা ফেলছে—আর এক ঝলক আলো!

সহসা আকাশ-ফাটানো একটা তুমুল শব্দ, আর তারপরই শত শত তুবড়ি আর হাউই উঠল শূন্যপথে। লালে নীলে হলুদে গোলাপীতে সে কী আলোর প্লাবন! এই তুবড়িবাজিই হল সংকেত। রাজপুত্র সদলে নামতে আরম্ভ করলেন সোপান বেয়ে। আলোকের প্রপাত যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল, গিরিগাত্রের জলপ্রপাতের মত।

"জয় প্রিন্স অব্ ওয়েলস্-এর জয়!"—তুমুল নিনাদ উঠছে প্রতি মুহূর্তে। প্রিন্সবেশী টম ক্যান্টির মনে কী ভাবের উদয় হচ্ছে কে তা বলবে? সে কি ভাবছে আঁস্তাকুড় বস্তির চারতলার আঁধার খুপরিখানার কথা? জীর্ণ চীরে অঙ্গ ঢাকা আর মা-বোনেদের কথা? কে জানে! মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়। এই বিশেষ মুহূর্তে সে যদি সব ভুলে নিজেকে সত্যিকার প্রিন্স অব ওয়েলস্ বলেই ভেবে থাকে, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

জন ক্যান্টি আর তার মায়ের হাতে বেদম মার খেয়ে আসল

রাজপুত্র ততক্ষণ খড়ের গাদার উপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। মার খাওয়ার কারণ আর কিছু নয় শুধু এই যে, সে ভিক্ষা করে কিছুই আনে নি, উপরন্তু খেপে গিয়ে নিজেকে প্রিন্স অব ওয়েলস্ বলে জাহির করছে, আর জন ক্যান্টির ধমকের জবাবে তাকে উলটে শাসিয়েছে এই বলে যে রাতটা ভোর হলেই তার পিতা মহারাজা অষ্টম হেনরী ওই দুর্বৃত্ত জন ক্যান্টিকে ফাঁসিতে লটকাবেন।

গভীর রাত্রি! সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। একমাত্র টমের মা ছাড়া! সেই অভাগিনী নারী বড় সংশয়ে পড়েছে। এ-ছেলে কিছুতেই নিজেকে ক্যান্টির ছেলে বলে স্বীকার করছে না। খেপে যাওয়া? তা অবশ্য অসম্ভব নয়। কিন্তু ছেলেটা খেপেছে এই বললেই এ সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসন হচ্ছে না। ছেলেটার ভিতরে একটা গাম্ভীর্য, একটা মর্যাদার অভিব্যক্তি মুহূর্তে মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। তার কথাবার্তার ধরন পালটে গিয়েছে। ঘুমের ঘোরে সে এমন সব লর্ডদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে, যাদের নাম এর আগে কখনো এ খুপরির বাসিন্দারা শোনে নি। টম ক্ষেপতে পারে, কিন্তু এসব পরিবর্তন তার কী ভাবে হল?

সত্যিই কি এই ছেলে তার টম নয়?

না যদি হয় টম, তবে ও কে? দেখতে ঠিক টমেরই মত? আর টমই বা তাহলে গেল কোথায়?

আশ্চর্য! প্রিন্স নিজে যে কথাটা সহস্রবার বলছেন, সেটার ভেতরে যে কিছুমাত্র সত্যও থাকতে পারে, একথা একজনেরও এক মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছে না।

রাত্রি গভীর! সবাই নিদ্রায় অচেতন, এমনকি হতভাগ্য রাজপুত্রও। সেই সময়ে রাস্তায় একটা হল্লা শোনা গেল। অনেক লোক যেন এই বাড়িরই দরজায় দাঁড়িয়ে একসাথে কথা কইছে। না, তারা নীচে দাঁড়িয়ে নেই। তারা সবাই উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে! খুপরিতে খুপরিতে দরজা খুলে গেল, প্রতি ঘরের বাসিন্দারা বিছানা

ছেড়ে উঠে এল—রাত্রিবেলায় এই শান্তিভঙ্গের কারণ জানবার জন্য।

কোথাও না থেমে, কারও কথার জবাব না দিয়ে জনতা উঠে এল ক্যান্টির দরজায়। জোরে জোরে দ্বারে করল করাঘাত। ঘুম ভেঙে গেল সবাইয়েরই। জন ক্যান্টি চোখ মুছতে মুছতে উঠে এল ক্রুদ্ধভাবে

"কী হে, রাতের বেলায় বাড়ি চড়াও হয়ে কী করতে চাইছ তোমরা? আমার কি হঠাৎ লক্ষ পাউণ্ড পকেটে এসেছে যে তাই লুটে নিতে এসেছ? ব্যাপার কী?"

"ব্যাপার গুরুতর হে, ব্যাপার গুরুতর!" -অনেক লোক এক সাথে কথা বলে ওঠে -"প্রাণ যদি বাঁচাতে চাও, এই বেলা পালাও। এখন একটা লোকের মাথায় তুমি লাঠি মেরেছিলে মনে আছে? মারা গেছে লোকটা।"

"মারা গেছে ত হয়েছে কী? আঁস্তাকুড় বস্তিতে একটা মানুষের মরে যাওয়া কি খুব অসাধারণ ব্যাপার? এমন দিন কবে যায়, যেদিন দুটো একটা অমন অপঘাতে মরে না।"

"আহা, সে সব লোক আর এই লোকটাতে তফাত আছে হে! তুমি যাকে ঘায়েল করেছ, সে হচ্ছে পাদরী অ্যানড্রু। আঁস্তাকুড় বস্তিতে বাস করত বটে, কিন্তু পণ্ডিত লোক, এককালে পাদরী ছিল, জানাশোনা বড়লোক কত আছে ওর, জানো? রাজা ওকে চাকরি থেকে ছাড়িয়েছিলেন, কিন্তু ওর মাসোয়ারা বন্ধ করতে পারেন নি, তাতেই কি বোঝা যায় না যে ওর পেছনেও লোক আছে? সেই সব লোকের কাছে ওর মৃত্যুসংবাদ চলে গেছে এতক্ষণ!"

ঘোঁতঘোঁত করে ওঠে জন ক্যান্টি। এতটা সে ভাবেনি তো। খুন করলে তার আবার ঝামেলা পোয়াতে হয়, এমন কথা তো আঁস্তাকুড় বস্তির কেউ বলে নি তাকে!

কে একজন বলে উঠল—"যদি পালাতে হয় ত এই বেলা। একটু বাদেই যদি পুলিস এসে পড়ে, ফাঁসি থেকে আর নিস্তার নেই।"

জনতা নিজেদের কর্তব্য করেছে, এই বেলা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

এদিকে জন ক্যান্টির বিষম ভয় ধরে গিয়েছে। ফাঁসি! ওরে বাবা। ওতে সে মোটেই রাজী নয়। সে হাঁকডাক শুরু করে দিল—"এক্ষুনি! সবাই এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। পালাতে হবে, একেবারে লণ্ডন ছেড়ে পালাতে হবে আমাদের। মফস্বলে, যেখানে কেউ আমাদের মোটেই চেনে না। শিগগির এস, শিগগির!" এত বলে সে রাজপুত্রের হাত ধরে টেনে তুলল—"বাজার ব্যাটা এখনও বিছানায় পড়ে আছে? শুনছ না, এখানে থাকলে ফাঁসি যেতে হবে?"

"ফাঁসি যেতে হবেই তোমাকে!"—বলেন রাজপুত্র গম্ভীরভাবে—"সে তুমি যেখানেই যাও! রাজপুত্রের গায়ে হাত তুলেছ তুমি, তোমার নিস্তার নেই কিছুতেই।"

উত্তরে এক গাঁট্টা মারল জন—"আমার নিস্তার আছে কি নেই, তা আমি বুঝব। এখন তর্কের সময় নেই। চল্—"

এত বলে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল রাজপুত্রকে। সবাই এসে রাস্তায় দাঁড়াল! এইখানে এসে জন ক্যান্টি সবাইকে সম্বোধন করে বলল—"আমরা আপাততঃ যাচ্ছি লণ্ডন পুলে। তার ওমাথায়। বড় রাস্তায় ওঠবার পর কোন কারণে হয়ত আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে। তা যদি হয়, তাহলে প্রত্যেকেই যেন লণ্ডন ব্রিজের ও-মাথায় গিয়ে অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করে। রাজপুত্রকে অবশ্য আমি নিজের সঙ্গে রাখবই। ওঁর যা মেজাজ, ছাড়া পেলে তো উনি আমাদের কদলী দেখিয়ে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদের দিকেই পা বাড়াবেন।"

এই বলে জন ক্যান্টি পথ চলা শুরু করল। রাজপুত্রের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। রাজপুত্রের আপ্রাণ চেষ্টা ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে। তবু ক্যান্টি হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে।

পরিবারের অন্য সবাই ভয়-পাওয়া ভেড়ার পালের মত দ্রুত হাঁটছে জন ক্যান্টির পেছনে পেছনে।

আঁস্তাকুড় বস্তি ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা রাস্তায় পৌঁছালো সবাই। এখান থেকেই শোনা যেতে লাগল তুমুল একটা কোলাহল। সহস্র সহস্র কণ্ঠের উল্লাসের ধ্বনি। জন ক্যান্টি দ্বিগুণ ভয় পেয়ে গেল—এই লোকেরা নিশ্চয় তাকেই ফাঁসিতে ঝোলাতে আসছে! সে ছুটতে লাগল রাজপুত্রকে নিয়ে। পেছনে স্ত্রী কন্যা বা বুড়ো মা রয়েছে, তারা সঙ্গে আসতে পারছে কিনা, সেদিকে আর তাকাবার তার ফুরসত নেই।

ছুটতে ছুটতে একটা মোড় ঘুরেই সে রাজপথে এসে পড়ল, আর অমনি সে ডুবে গেল এক আদিঅন্তহীন জনসমুদ্রের মাঝে। উত্তাল সেই জনসমুদ্র আনন্দে উন্মত্ত যেন! যুবক বৃদ্ধ নারী পুরুষ নৃত্য করছে, লাফাচ্ছে, চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে—"জয় যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলসের জয়!" আর চলছে মদ। বড় বড় কাঠের গামলা, দুপাশে মোটা মোটা জোড়া আংটা লাগানো এদিকে একজন ধরেছে, ওদিকে আর একজন, উঁচু করে চুমুক দিচ্ছে সেই গামলা থেকে এর নাম হল প্রেমের পেয়ালা। ভিড়ের ভেতর এতে চুমুক দিতে হঠাৎ কেউ সাহস করে না, কারণ দুটো হাতই জোড়া থাকে চুমুকের সময়, সেই সুযোগে কেউ তোমার পকেট মেরে দিয়েও যেতে পারে, তলপেটে ছোরাও বসিয়ে দিতে পারে

নানা রঙের পতাকা উড়ছে, নানা সুরে গর্জন করছে জনতা, নানাবিধ আনন্দে মাতোয়ারা সবাই! এই উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া লক্ষলোকের ভিড়ের ভেতর এসে পড়ল জন ক্যান্টি। যুবরাজের হাত সে শক্ত করে ধরে রেখেছে, কিন্তু তার পরিবারের সবাই যে কে কোথায় ছিটকে পড়ল চোখের পলকে, তা সে টেরই পেল না। তবে তার ভরসা আছে—লণ্ডন পুলের ও-মাথায় গিয়ে সবাই অপেক্ষা করবে তার

জন্যে। অবাধ্য শুধু এই টম ছোকরা। অবাধ্য, কারণ পাগল। একে ধরে না নিয়ে গেলে এ বোধহয় সঙ্গে যাবে না।

কিন্তু ধরে রাখা সম্ভব হল না বেশীক্ষণ। ভিড় এসে চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপরে, যেমন করে ছোট্ট দ্বীপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমালা। তারই ভেতর দিয়ে পথ কেটে নিয়ে সে প্রাণপণ যুঝছে লণ্ডন ব্রিজের দিকে অগ্রসর হবার জন্য। কিন্তু ভিড়ের মাঝে তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীতই ঘটে। জন ক্যান্টিরও ঘটল তাই। একটা ভয়ংকর মোটা ছুতোরের সঙ্গে লাগল তার ধাক্কা। সে-লোকটা থাবা মেরে ধরল ক্যান্টির ঘাড়।

"ওহে ওহে ওহে বন্ধু! ব্যাপার কী, এত ধাক্কাধাক্কি কেন?"

বিরস মুখে ক্যান্টি বলল - "বন্ধু বলে ডাকছ, বন্ধুর কাজই কর। যেতে দাও আমাকে। তাড়া আছে খুব!"

"তাড়া?" লোকটা যেন ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে যায়—"তাড়া কী রকম? আজকের রাতে তাড়া? প্রিন্স অব্ ওয়েলসকে ভোজ দিচ্ছি আমরা গিল্ড হলে, ঠিক সেই সময়ে তোমার তাড়া? মহা পাপ! বলি, তোমার রাজভক্তি বলে কোন বস্তু নেই?"

"আছে আছে, তোমার চেয়ে কম নেই। কিন্তু কাজ থাকলে—গরিব মানুষ -"

"দুপুর রাতে কোন সৎ লোকের কোন তাড়াতাড়ির কাজ থাকা উচিত নয়।" ঝাঁঝিয়ে উঠল ছুতোর:—"শোন বাপু, যদি তাড়াতাড়ি যেতে চাও, প্রেমের পেয়ালায় একটি চুমুক দিয়ে চলে যাও।"

যে-কথা সেই কাজ! গামলা কাছেই রয়েছে, দুইজনে সেটা টেনে নিয়ে এল জন ক্যান্টির সামনে। ওরা ধরেছে একটা দিক, ক্যান্টিকে ধরতে হবে অন্য দিকটা। দুটো আংটা, দুটোই ধরতে হবে, তা নইলে কাত হয়ে পড়বে এক কোণে। জন ক্যান্টির মতলব ছিল না, কিন্তু

লোকের শাসানিতে তাকে বাধ্য হয়েই ছুহাত লাগাতে হল গামলায়। ওদিক থেকে গামলার কিনারা উঁচু হল, ক্যান্টি মুখ লাগাল এদিকের কিনারায়—

আর রাজপুত্র? তিনি কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, কতক্ষণে ক্যান্টির সুরাপান শেষ হবে, তারই জন্য প্রতীক্ষা করে? যীশু কহো! তেমনি নির্বোধই বটে তিনি! গামলায় ছুই হাত লাগাবার প্রয়োজনে ক্যান্টিকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল রাজপুত্রের হাত, অমনি এক মুহূর্তের দেরি না করে তিনি তলিয়ে গেছেন সেই জনসমুদ্রে। বরং আটলান্টিক মহাসাগরের তলা থেকে হারানো জিনিস খুঁজে বার করা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু ভোজের রাতের লণ্ডন-রাজপথের জনতার ভেতর থেকে অনিচ্ছুক পলাতক কাউকে খুঁজে বার করা একেবারেই অসম্ভব!

অসম্ভব যে, তা জন ক্যান্টিকেও অচিরেই স্বীকার করতে হল। প্রেমের পেয়ালাতে চুমুকটা তার একটু দীর্ঘই হয়েছিল, কারণ সুরার উপর আসক্তি তার খুব বেশী। অথচ সেই সুরা বস্তুটা জোটানোই তার পক্ষে সব দিন ঘটে ওঠে না। আগের দিনও ঘটে নি, কাজেই আজ গামলা ভর্তি সোনালী পানীয়ের আকর্ষণ সে সহজে বা খুব শীঘ্র কাটিয়ে উঠতে পারল না। পারল যখন, পেয়ালা থেকে মুখ নামিয়ে সেটা অন্য হাতে চালান করে দেবার সুযোগ তার হল যখন, তখন পাশের দিকে তাকিয়ে, সে নিজের চুল-দাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল। হতভাগা ছোঁড়া পালিয়েছে!

জন ক্যান্টি উন্মাদের মত এদিকে ছোটে, ওদিকে ছোটে, এবং প্রতি দিক থেকেই উৎসব মত্ত নাগরিকদের কাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে ফিরে আসে! অবশেষে অতি কষ্টে সে ভিড়ের কেন্দ্রস্থল থেকে নিজেকে বার করে আনল বটে, কিন্তু পাগলা ছেলেটার টিকিটিও সে আর কোথাও দেখতে পেল না।

কোথায় গেল সে? কোথায় গেল পাগলা টম?

কিন্তু জন ক্যান্টির পক্ষে আর বেশীক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বেড়ানো নিরাপদ নয়। পুলিস এসেছে ওদিকে। পাদরী অ্যানড্রুর হত্যা-কারীর সন্ধানে ওলটপালট করে ফেলছে আঁস্তাকুড় বস্তি। জন ক্যান্টি আর কোন্ ভরসায় অপেক্ষা করবে এই বিপজ্জনক এলাকায়? সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল লণ্ডন ব্রিজের দিকে। পার হয়ে গেল অতবড় ব্রিজটা। এদিকে ওদিকে চাইছে, পরিবার-ভুক্ত লোকগুলোকে দেখা যায় যদি। ক্যান্টির দেরি হয়েছিল প্রেমের পেয়ালার পাল্লায় পড়ে এবং তারপর বদমাইশ ছেলেটার জন্য খোঁজাখুঁজি করে। অন্য কারও তো সে-রকম দেরি হওয়ার কথা নয়!

কিন্তু কই! তাদের কাউকেই তো দেখা যায় না! গেল কোথায় সব? মা, বউ, দুই দুটো মেয়ে? পইপই করে প্রত্যেককে এই ব্রিজের মাথায় এসে দাঁড়াবার কথা বলা হয়েছে, তবু—

আসল কথা এই—বুড়ী মা-টা ভিড়ের চাপে বেদম জখম হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়, দেখবার কেউ নেই তাকে! ন্যাক এবং বেটি এবং তাদের মা এরাও এক একজন ছিটকে পড়েছিল এক এক দিকে, কিন্তু দৈব ওদের ওপর প্রসন্ন বুঝি—ওরা আবার তিনজনে একত্র হতে পেরেছে, এবং পেরেই লণ্ডন ব্রিজের ঠিক উলটো মুখে চলেছে ওরা। জীবন ওদের তিতো করে ছেড়েছে এই ক্যান্টি আর তার দজ্জাল মা। এখন, এতকাল বাদে আজ যখন তাদের দুজনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে, তখন যে কয়দিন স্বাধীনতা ভোগ করা যায়—করা যাকই না। ধরা অবশ্য পড়তে হবেই একদিন, তা সে হবে যখন, তখন হবে।

খাওয়া? জন ক্যান্টি ওদের থোড়াই খেতে দেয়। বরং ওদেরই ভিক্ষার রুটিতে সে প্রায় রোজই ভাগ বসায়। তার রোজগার তো চুরি! সে-কাজের সুযোগ রোজ মেলে না। যখন মেলে, তখন মোটা অর্থ পায় বটে, কিন্তু সবই উড়িয়ে দেয় মদ খেয়ে। স্ত্রী-কন্যার ভোগে তার এক পেনিও আসে না।

ওদের কথা ছেড়ে দিয়ে রাজপুত্রের কথায় আসা যাক।

রাজপুত্র নিজেকে উদ্ধার করেছেন অবশেষে ওই রাক্ষসটার কবল থেকে। আগের দিনটা উপবাসেই গিয়েছে। বর্বর ছোটলোকদের হাতে প্রহার খেয়ে খেয়ে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাওয়ার মত হয়েছে। তবু, অবসন্ন দেহেও এই মুহূর্তে নতুন উৎসাহ বোধ করছেন তিনি। কারণ, বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ হয়েছে তাঁর।

প্রথম কর্তব্য, পালানো! ওই রাক্ষসটার সান্নিধ্য থেকে যত দূরে যাওয়া যায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় কর্তব্য, গিল্ডহলে পৌঁছানো। মনে পড়েছে রাজপুত্রের, আজ রাত্রেই পৌরসভার লর্ড মেয়রের ভোজ হওয়ার কথা। দুই মাস আগে তাঁর পিতা মহারাজ অষ্টম হেনরি কথা দিয়েছিলেন যে এই ভোজের উপলক্ষ্যে যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আতিথ্যগ্রহণ করবেন গিল্ডহলে। আজই সেই ভোজ বটে!

ভোজ ঠিকই হচ্ছে। যুবরাজের দর্শনার্থী লক্ষ লক্ষ লণ্ডনবাসী ঠিকই মিছিল করে বেরিয়েছে রাজপথে রাজপথে। যুবরাজের নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি লক্ষ কণ্ঠে উৎসারিত হচ্ছে আকাশবাতাস বিদীর্ণ করে। সবই ঠিক নিয়মমত অগ্রসর হচ্ছে—যদিও সমস্ত উৎসবের কেন্দ্রপুরুষ স্বয়ং যুবরাজই অনুপস্থিত।

এতে প্রমাণ হয় শুধু একটা জিনিস। প্রমাণ হয় যে যুবরাজের অনুপস্থিতির কথা কেউ জানে না। এর অর্থ?—এর অর্থ এই যে জাল যুবরাজ উদয় হয়েছে একজন। অর্থাৎ সেই টম ক্যান্টি আঁস্তাকুড় বস্তির বাসিন্দা ন্যাকড়া-পরা সেই বালক—যার পরিধানের ন্যাকড়া এই যে এখনও যুবরাজের অঙ্গে শোভা পাচ্ছে।

সুতরাং যুবরাজের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে—গিল্ডহলে ছুটে যাওয়া। গিয়ে অগণিত ভক্ত প্রজার সম্মুখে নিজের পরিচয় দিয়ে জাল যুবরাজকে ধরিয়ে দেওয়া। এতে দুই পাখি এক ঢিলে মরবে। যুবরাজের নিজের দুর্দশারও অবসান হবে! আর ওই প্রতারক ছোকরার দুঃসাহসেরও উচিত দণ্ড হবে।

ভিড় ঠেলে যথাসম্ভব দ্রুত যুবরাজ গিল্ডহলের দিকে ছুটলেন।

ততক্ষণে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ থেকে টম ক্যান্টি দলবল নিয়ে এসে পড়েছে! নিজে সে যুবরাজের স্থান এবং মর্যাদা অধিকার করে বসেছে। তার পাশে রয়েছেন দুই সুন্দরী রাজকুমারী—এলিজাবেথ ও জেন—যুগপৎ সঙ্গিনী এবং পরামর্শদাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁদের এখনও দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজপুত্রের মস্তিষ্কের গোলমাল হয়েছে। দুইদিন মানসিক পরিশ্রম বন্ধ রেখে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ করতে থাকলে, ও বিকৃতি শুধরে যাবে অতি শীঘ্র। কাজেই রাজপুত্রকে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে তাঁদের ঐকান্তিক প্রয়াসে এক মুহূর্তের বিরতি নেই।

টম ক্যান্টি রাজসজ্জায় সেজেছে। রাজার বজরায় সুখাসনে আসীন হয়ে পরম আনন্দে সে তরতর করে ভেসে চলেছে গিল্ডহলের দিকে। তখনকার দিনে লণ্ডনের বুক চিরে প্রবাহিত হত অনেকগুলি শীর্ণা স্রোতস্বিনী, কোনটা টেমসের শাখা, কোনটা বা উপনদী। এরই অন্যতম ছিল ওয়ালব্রুক, গিল্ডহলের পাশ দিয়েই ছিল এর প্রবাহ। বজরার মিছিল এসে প্রবেশ করল এই ওয়ালব্রুকে।

প্রতি বছরই দুই একবার এই রকম মিছিল আসে বলে ওয়াল-ব্রুকের খাতের একটা জায়গা চওড়া করে কেটে একটা বিস্তীর্ণ সরোবর সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই অসংখ্য বজরা এসে একে একে এই

সরোবরে ঢুকল, নোঙর ফেলল ডাইনে বাঁয়ে, জনাকীর্ণ কূল ঘেঁষে ঘেঁষে। টম যেখানে নামবে বজরা থেকে, লাল কার্পেট পেতে দেওয়া হয়েছে সেইখান থেকে গিল্ডহলের সিঁড়ি পর্যন্ত।

সেইখানেই লণ্ডনের লর্ড মেয়র এসে দাঁড়িয়েছেন পৌরপিতাদের সঙ্গে নিয়ে। পরম সমাদরে, অশেষ সম্মানের সঙ্গে টম ক্যান্টিকে তাঁরা নৌকা থেকে নামিয়ে নিলেন। রাজকুমারীরাও নামলেন টমের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তাঁরা মিছিল করে চীপসাইড পেরিয়ে গেলেন। মিছিলের আগে আগে চলেছে ঘোষকেরা। বাহকের স্কন্ধে চেপে চলেছে লণ্ডন শহরের শক্তির প্রতীক লৌহগদা ও তরবারি। টমের পেছনে, সেই সব রাজসভাসদ লর্ড ও মহিলারা, যাঁরা তার সঙ্গে এসেছেন ওয়েস্টমিনস্টার থেকে।

স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপের নীচে উঁচু মঞ্চ, তার ওপর টম ক্যান্টি ও দুই রাজকুমারী! মঞ্চের নীচে অতি দীর্ঘ টেবিল একখানি, তার দুইধারে অভিজাত লেডি ও লর্ডেরা। রাজপ্রাসাদ সম্পর্কিত যাঁরা, তাঁরাও আছেন, পৌরসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, আছেন তাঁরাও। এই টেবিলের চাইতেও নীচু স্তরে ছোট ছোট অসংখ্য টেবিল, গণ্যমান্য নাগরিকদের আসন নির্দিষ্ট হয়েছে সেইগুলিতে।

প্রাচীরের গায়ে দুই অতিকায় দৈত্যের মূর্তি আঁকা, এরা লণ্ডনের পৌরাণিক অভিভাবক—গগ ও ম্যাগগ। নীচের এই মহাভোজের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটা তূর্যধ্বনি শোনা গেল, তারপরে একটা ঘোষণা, তারও পরে ভুঁড়িওয়ালা প্রধান পরিবেশক দেখা দিল বাঁদিকের প্রাচীরের গায়ে এক উঁচু ঝরোকায়, তার পেছনে পেছনে ভৃত্যেরা নিয়ে এসেছে ধূমায়মান আস্ত একটা ঝলসানো ষাড়। ওইটি দিয়েই ভোজের শুরু হবে।

ধর্মযাজক স্বস্তিবাচন করে সরে গেলেন, কে একজন লর্ড কানে কানে টমকে স্মরণ করিয়া দিলেন—এসময়ে তার করণীয় কী।

শিক্ষামত সে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সমবেত জনতা। সোনার একটি বৃহদাকার প্রেমের পেয়ালার একদিকে ধরল টম, অন্যদিকে ধরলেন রাজকন্যা এলিজাবেথ, তারপরে পেয়ালা এপাশে কাত হল—পান করল টম। ওপাশে ঝুঁকল—পান করলেন রাজকুমারী। এবার পালা এল জেন গ্রের, এবং তাব পরে সমবেত জনতাব। ভোজ শুরু হল।

রাত দুপুর নাগাদ উৎসব একেবারে চরমে পৌছোল। তখন নাচ শুরু হয়েছে। সাধারণ নাগরিকেরা তো নাচছেই, সোনাদানায় ঝলমল লেডি এবং লর্ডেরাও নাচতে কুণ্ঠা করছেন না। কতক লর্ড-লেডিরা আবাব খেয়ালখুশীমত বিদেশী পোশাক পরে এসেছেন। কারও পবিধানে রুশ পরিচ্ছদ, কারও পরিধানে প্রুশীয়। বাদকেরা তো কালিঝুল মেখে একেবারে মূর সেজে এসেছে।

টম ক্যান্টি বসে বসে দেখছে এই আনন্দোৎসব—অঙ্গে তাব মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ, পার্শ্বে তাব দুই রূপসী রাজকুমাবী, সম্মুখে তার শ্রদ্ধানত ভক্ত প্রজাবৃন্দ। ভিখারীর সন্তানের এ কী ভাগ্যোদয়!

আর সত্যিকার যিনি প্রিন্স অব্ ওয়েলস্—এই উৎসবে নেতৃত্ব নেবার, সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানের কেন্দ্রমণি হিসাবে সহস্রজনেব অন্তরের প্রীতি অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করবার বিধিদত্ত অধিকার যাঁর ছিল—তিনি তখন এই গিল্ডহলেরই দরজাতে জীর্ণ চীর পরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন—"আমায় ভেতরে যেতে দাও। আমিই সত্যিকার প্রিন্স অব্ ওয়েলস্। এই উৎসবে আমারই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাওয়ার কথা। ভেতরে যে বসে আছে, সে প্রতারক। আমায় দেখে তোমরা চিনতে পারছ না?"

"পারছি না?" উপহাসে বিদ্রূপে অট্টহাস্য করে উঠছে পানোন্মত্ত নাগরিকেরা—"ওই. ছেঁড়া কাপড়ের ভেতর ভবিষ্যৎ রাজপুত্রকে আবিষ্কার করতে পারা তো মোটেই কিছু শক্ত কাজ নয়। রাজ-

পুত্রের মত রাজপুত্রই সেজেছ বটে, কারও আর ভুল হওয়ার জো নেই।'

ব্যঙ্গবিদ্রূপে আরও রেগে যান রাজপুত্র, চিৎকার করে বলেন—"বেয়াদব কুকুরেরা! আমি আবার বলছি—আমিই প্রিন্স অব্ ওয়েলস্। এই মুহূর্তে আমায় সাহায্য করবার মত রাজভক্তিমান কাউকেই আমি দেখতে পাচ্ছি না যদিও, তবুও নড়ব না এখান থেকে আমি কিছুতেই। প্রবেশ আমি করবই ভোজসভায়।"

"বেয়াদব কুকুর!" একটা জীর্ণ চীরপরা আঁস্তাকুড়ের জীবের মুখ থেকে এ-ভাষা বরদাস্ত করতে রাজী নয় লণ্ডনের স্বাধীন নাগরিকেরা। তারা ইট পাটকেল ছুড়তে শুরু করল রাজপুত্রকে লক্ষ্য করে। কয়েকজন ধেয়ে এল তাঁকে ধরে নিয়ে ঘোড়া ধোয়ানোর ডোবায় ছুড়ে ফেলবার জন্যে। রাজপুত্রের ভ্রূক্ষেপ নেই, আক্রমণের মুখেও অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করে যাচ্ছেন—"তোরা সব ফাঁসি যাওয়ার যোগ্য। আমি প্রিন্স অব্ ওয়েলস্. আমিই রাজপুত্র!"

হঠাৎ কে একজন চেঁচিয়ে বলল—"রাজপুত্র হও বা না হও, তুমি খুব সাহসী ছোকরা। কে বলে তোমায় সাহায্য করবার কেউ নেই? আর কেউ না থাক, মাইলস্ হেণ্ডন আছে। নিজে বীর হয়ে, তোমার মত বীর বালককে এই ছোটলোকদের হাতে মার খেতে সে দেবে না।"

"ছোটলোক?" নাগরিকেরা এই লোকটির ওপরেও ক্ষাপ্পা হয়ে উঠল। - "এরা দুটো এক জুটির জোচ্চোর? দুটোকেই এক-সাথে নিয়ে চুবিয়ে মারো ডোবায়।"

অবশ্য সেটা বলা সোজা, করা অত সোজা নয়। মাইলস্ হেণ্ডন নাম নিয়ে যে লোকটি একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই বঞ্চিত রাজপুত্রের পাশে এসে দাঁড়াল, চেহারায় সে লম্বা-চওড়া দর্শনধারী পুরুষ। রীতিমত বলিষ্ঠ পুরুষ বলেই মনে হয়। কটিতে তার লম্বা তরোয়ালও আছে একখানা। বেশভূষা অতি মূল্যবান ছিল

এককালে, কিন্তু এখন সেগুলি পুরোনো এবং জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। মোটের ওপরে তাকে দেখলে মনে হবে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে —সাময়িকভাবে দুর্দিনে পড়েছে।

নাগরিকদের কিন্তু অত কিছু দেখবার বা ভাববার দরকার নেই। তারা রেগে গিয়েছে, খুব দারুণ রকমই রেগে গিয়েছে। জনতার রাগ হলে বুদ্ধি-বিবেচনার বালাই থাকে না আর। বুনো শুয়োরের মত গোঁ ধরে এক দিকেই ধাওয়া করে। এক্ষেত্রেও তাই হল। সমুদ্রের জোয়ার যেন এসে ভেঙে পড়ল মাইলস্ হেণ্ডনের ঘাড়ে। রাজপুত্র? মাইলস্ তাঁকে ঠেলে নিজের পেছনে হটিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ তরবারি খুলে মাইলস্ জনতাকে প্রতিরোধ করছে। প্রথম প্রথম আত্মরক্ষাই করছিল, কিন্তু নিজের গায়ে দুই একটা আঘাত এসে পড়তেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তার। ওধার থেকে আসছে পাথরের টুকরো, লাঠির ঘা। মাইলস্ হাঁকাচ্ছে তরোয়াল, ডাইনে বাঁয়ে, আলোয়-আলো গিল্ডহলের সমুখে সে তরোয়ালের ফলা যেন বিদ্যুতের জিহ্বার মত খেলতে লাগল। ঘায়েল হল অনেকগুলো মানুষ। তখন তারা সাবধান হল একটু। খুব কাছে ঘেঁষে না এসে দূর থেকে ঢিল ছুড়তে লাগল। ক্রমাগত পাথর বৃষ্টি। রাস্তায় পাথরের অভাব নেই। হেণ্ডনের মাথায় মুখে শিলাবৃষ্টি হতে লাগল যেন। রাজপুত্র? হেণ্ডন তাঁকে নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তাঁর গায়ে একটিও আঁচড় লাগছে না।

কিন্তু এভাবে হেণ্ডন কতক্ষণ যুঝবে? তার মাথা ফেটে গেল পাথরের আঘাতে, নাক মুখ ছড়ে রক্ত ঝরতে লাগল। হাজার লোকের আক্রমণ একা সে সইবে কেমন করে? সে ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। জনতাও তা বুঝতে পেরেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে নতুন করে ধেয়ে আসছে তাকে আর তার আশ্রিত ভিখারীর বাচ্চাটাকে পিষে মারবার জন্যে।

এবার আর রক্ষা নাই। মাইলসেরও না, রাজপুত্রেরও না।

এক্ষুনি তাদের বেঁধে নিয়ে ঘোড়া পুকুরে চুবিয়ে মারবে ক্রুদ্ধ হিংস্র জনতা।

কিন্তু হঠাৎ—একটা তূরী বেজে উঠল কোথায়!

সঙ্গে সঙ্গে খটাখট খটাখট বহু অশ্বের পদধ্বনি। ঝড়ের বেগে একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে শহর থেকে এই গিল্ডহলের দিকেই। এসে পড়ল ওরা। ওদেরই একজন চিৎকার করে বলছে—"পথ ছাড়ো! রাজার বার্তাবহকে পথ ছাড়ো!"

পথ ছাড়ে কি না ছাড়ে—দেখবার জন্য তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে না। ঘোড়া ছুটিয়ে তারা সমান বেগেই ধেয়ে আসছে। যার প্রাণের মায়া থাকে, সরে যাও। না যদি যাও, ঘোড়ার পায়ের তলায় চাপা পড়বে এক্ষুনি।

জনতা সরে গেল, উবে গেল ম্যাজিকের মত।

মাইলস্ আর রাজপুত্র দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের পাশ দিয়ে ছুটে অশ্বারোহীদল ঢুকে গেল গিল্ডহলের তোরণপথে। আর অমনি মাইলস্ ছুট দিল রাজপুত্রের হাত ধরে। জনতা ফিরে এসে আবার আক্রমণ করবার সুযোগ না পায়!

রাজপথ ছেড়ে গলিপথ। এ গলি থেকে ও গলি। জনতার কোলাহল আর শোনা যায় না। সমুখে ওই লণ্ডন ব্রিজ। মাইলস্ হেণ্ডনের অস্থায়ী বাসা ঐ ব্রিজেরই এক হোটেলে। মাইলস্ সেই বাসার দিকেই পা চালিয়ে দিল।

*

* *

গিল্ডহলের ভেতরে তখনও রুশ পোশাক পরা লর্ড আর প্রুসীয় পোশাক-পরা লেডিদের উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে তাল রেখে রেখে মূরবেশী বাদকেরা নানা বিচিত্র বাজনা বাজিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাদের তালভঙ্গ হল, ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল রাজ-বার্তাবহ অশ্বারোহীর দল—সঘন

তূরীধ্বনির মাঝে মাঝে মুখে তাদের গম্ভীর নির্ঘোষ—"পথ ছাড়ো! রাজ-বার্তাবহকে পথ ছেড়ে দাও।"

পথ তো ছেড়ে দিয়েছেই, অবাক্ বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে আছে তাদের দিকে—প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ থেকে আরম্ভ করে দীনতম নাগরিক পর্যন্ত। কেউ বুঝে উঠতে পারছে না—কী এমন জরুরী বার্তা, যা জানাবার জন্যে রাজা গিল্ডহলেই দূত পাঠালেন রাজপুত্রের কাছে।

সকল জল্পনার অবসান করে দিয়ে বার্তাবহ উচ্চগম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠে সংক্ষেপে ঘোষণা করল— "শোন সর্বসাধারণ ইংলণ্ডবাসী, রাজার মৃত্যু হয়েছে!"

রাজার মৃত্যু হয়েছে! রাজার মৃত্যু হয়েছে!

টম ক্যান্টির তাতে কী? কে সে রাজা? টমের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

রাজকুমারী এলিজাবেথ কেঁপে উঠেছেন, চোখে জল টলমল করছে, চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে জলধারা। কিন্তু টমের কী? তার চক্ষু শুষ্ক।

কিন্তু সে কথা থাকুক। রাজ-বার্তাবহের ঘোষণা শ্রবণমাত্র সমবেত জনতা, সেই হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে নতমস্তকে জানু পেতে বসে পড়ল মাটিতে। মাথা নীচু করে বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত মৃত রাজার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করল ভগবানের কাছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তারা এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল আবার, একসঙ্গে হাত বাড়াল আঁস্তাকুড় বস্তির বাসিন্দা টম ক্যান্টির দিকে—তারপর সহস্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠল—"রাজা দীর্ঘজীবী হোন!"

রাজা! রাজা! রাজা দীর্ঘজীবী হোন!

সন্দেহ নেই যে তারা টম ক্যান্টিকে লক্ষ্য করেই জয়ধ্বনি করেছে। টম ক্যান্টি বস্তিবাসী বালক, আজ সকালেই সে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্,

পদে উন্নীত হয়েছিল, আর রাত্রেই আর এক ধাপ উঁচুতে উঠে গিয়ে রাজা হয়ে বসল।

টম ক্যান্টি রাজা! উন্মাদেরও কল্পনার বাইরে ছিল যে বস্তু, তা দৈববশে সত্যে পরিণত হল নাকি?

হল বইকি! নইলে রাজকুমারী এলিজাবেথ, রাজকুমারী জেন তার পদতলে নতজানু হয়ে বসেছেন কেন? লর্ড হার্টফোর্ড এবং অন্য গণ্যমান্য রাজপুরুষেরাই বা রাজ কুমারীদের অনুসরণ করেছেন কিসের জন্য?

টম ক্যান্টির প্রশংসা করতে হয়—সেই পরম গৌরবের মুহূর্তে তার প্রথম মনে হল যে ব্যক্তির কথা—সে হল নরফোকের হতভাগ্য ডিউক, স্বর্গত মহারাজ অষ্টম হেনরির আদেশে এই রজনী প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যার প্রাণদণ্ড হতে যাচ্ছে।

লর্ড হার্টফোর্ডকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করল টম—"আমি রাজা?"

"নিঃসন্দেহ, মহারাজ!"

"আমার যে কোন আদেশ নির্বিচারে পালিত হবে?"

"নির্বিচারে, মহারাজ!"

"তা হলে এই মুহূর্তে আপনি টাওয়ারে সংবাদ পাঠান—রাজার আদেশ— নরফোকের ডিউকের প্রাণদণ্ড হবে না।"

জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল—"রক্তপাতের যুগ অবসান হল, দয়ার রাজত্ব শুরু হল ইংলণ্ডে। জয় মহারাজ ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের জয়!"

* * *

ততক্ষণে সারা লণ্ডনে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে দুঃসংবাদ —রাজার মৃত্যু। লোকের মুখে মুখে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছে আশ্চর্য রকম অল্প সময়ে। লণ্ডন ব্রিজে পদার্পণ করেই মাইলস হেণ্ডন্ খবরটা শুনতে পেল, শুনতে পেলেন ভিক্ষুকের বেশ-পরা রাজপুত্রও।

বুকের ভেতর সমস্ত উত্তাপটা নিবে গেল যেন রাজপুত্রের। এ কী

ঘোর বিপর্যয়! আজ সকাল থেকেই প্রিন্স-এর জীবনে যে ভয়াবহ ওলটপালট চলছে, তারই চরম পর্যায়—এই পিতৃবিয়োগ। পিতা নেই? নেই মহারাজ অষ্টম হেনরী? সারা পৃথিবী অষ্টম হেনরীকে জানত রক্তলোলুপ রাক্ষস বলে, ভয় পেত নির্মম অত্যাচারী দানব বলে, কিন্তু যুবরাজ এডোয়ার্ডের প্রতি সেই রাক্ষস, সেই দানবই ছিল পরম স্নেহশীল। কখনও কোন কর্কশ ব্যবহার পান নি যুবরাজ ওই পাষাণ-হৃদয় পুরুষের কাছ থেকে। বিনিময়ে সেই ভয়াল ব্যক্তিটিকেও রীতিমত ভালবাসতেন রাজপুত্র। আজ সহসা সেই পরম আশ্রয় রাজা হেনরী বিপন্ন পুত্রকে চিরতরে বিপদ-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে অনন্তধামে চলে গেলেন। রাজপুত্রের বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল; দুচোখ ভেসে গেল অশ্রুধারায়।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। জনতা চিৎকার করছে—"জয় মহারাজ ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের জয়!" —শুনেই গৌরবে বুকটা ফুলে উঠল রাজপুত্রের। এ জয়ধ্বনি তো তারই উদ্দেশে! ওই হতভাগ্যেরা জানে না যে যে-রাজার জয়ধ্বনি করে তারা আকাশ বিদীর্ণ করছে, জীর্ণ চীর পরে তিনিই পথ করে চলেছেন তাদেরই গায়ে গা মিশিয়ে। জানে না—সেটা তাদের দোষ নয়। দোষ এডোয়ার্ডের ভাগ্যের। কিন্তু ভাগ্য চিরদিন তাঁকে বিড়ম্বিত করতে পারবে না, নিজের স্থানে তিনি ফিরে যাবেনই একদিন, তখন এই মূঢ় প্রজারাই আগু বাড়িয়ে এসে তাঁকে নিবেদন করবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান।

রাজপুত্র ভাবতে ভাবতে পথ চলছেন। ভাবতে ভাবতে পথ চলছে মাইলস্ হেণ্ডনও। রাজা আর নেই—এ দুঃসংবাদ শুনেই সে ভাবতে শুরু করেছে না জানি এ খবর পেয়ে ওই উন্মাদ ভিখারী বালকের মনে এখন কী ভাবান্তর উপস্থিত হবে। এতদিন যদি সে নিজেকে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বলে চিন্তা করে থাকে, আজ থেকে তো তাহলে রাজা বলে নিজেকে ভাববে সে! না জানি সে বিভ্রাট আবার কী রকম হবে! ছেলেটা ভোগাবে দেখছি তাকে!

তা ভোগায় যদি, কী আর করা যাবে! ছেলেটার ওপর জোর একটা আকর্ষণ এসে গিয়েছে মাইলসের, কোন কারণেই ওকে সে ত্যাগ করে যেতে পারবে না। অনেক গুণ ওর আছে। কী সাহস! কী দৃপ্ত ভঙ্গী! মনের জোর অত্যন্ত বেশী না হলে একা অসহায় বালক ক্রুদ্ধ জনতাকে ওভাবে ধমক দিতে পারতে না। না, এ ছেলের ভেতরে আগুন আছে একটা। একে মানুষ করতে পারলে, এর মাথার অসুখটা সারিয়ে দিতে পারলে, একদিন এ নাম করবে পৃথিবীতে। হাঁ, মাথার অসুখ! ওটা যে এর আছে, তাতে মাইলসের কোন সন্দেহ নেই। ভিখারীর ছেলে হয়ে নিজেকে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বলে মনে করা—মস্তিষ্কবিকৃতির এর চেয়ে জোরালো প্রমাণ আর কী হতে পারে?

* * *

লণ্ডন ব্রিজটি এক আশ্চর্য জিনিস। ব্রিজ শুধু নয়, এটি ব্রিজের ওপরে নিজেই এ একটি ছোটখাট নগর। লম্বায় সিকি মাইলেরও কম, কিন্তু চওড়া সে আন্দাজে অনেক বেশী। মাঝখানে রাস্তা তো আছেই, তার দুই পাশে আছে দুই লাইন বাড়ি, দোতলা তিনতলা সব বাড়ি। সে-সব বাড়িতে না আছে কী? পুরুষানুক্রমে বাসিন্দা লোক আছে, তারা সপরিবারে স্থায়িভাবে এখানে থাকে। তাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস এই ব্রিজেই পাওয়া যায়। এখান থেকে এপারে লণ্ডন বা ওপারে সাউথওয়ার্কে যেতে হয় না কাউকে। রুটির দোকান, মাংসের দোকান, নাপিতের দোকান, দরজীর দোকান --সভ্য সমাজে থাকতে গেলে যে সব দোকান প্রত্যেক মানুষেরই দরকার হয়, তার কোনটারই এখানে অভাব নেই। এমন অনেক লোক এখানকার বাসিন্দাদের ভেতর আছে, যারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একবারও এক মুহূর্তের জন্যও এই সেতু থেকে নামে নি।

সব যখন আছে, তখন সরাইখানাই বা থাকবে না কেন? তাও

ব্রিজের ওপরে আছে একটি। তারই তিনতলাতে একখানা ক্ষুদ্র কামরায় বাসা নিয়েছে মাইলস্ হেণ্ডন। সবে গত কালই সে বিদেশ থেকে এসেছে, দীর্ঘ সাত বৎসর পরে। যাবে সুদূর পল্লী অঞ্চলে আত্মীয়স্বজনদের কাছে। পকেটে অর্থ বিশেষ কিছু নেই। কাজেই সস্তা হোটেল খুঁজতে হয়েছে। আগের দিনের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে লণ্ডনের অন্য কোন অংশের হোটেলের চাইতে সেতুর ওপরের হোটেলে খরচা কম লাগে।

যুবরাজকে নিয়ে কিংবা এখন আর তাঁকে যুবরাজই বা বলা কেন, সোজাসুজি রাজা বলাই সংগত—রাজাকে সঙ্গে নিয়ে মাইলস্ হেণ্ডন হোটেলের প্রবেশ পথের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা দুশমন চেহারার লোক দূর থেকে তেড়ে এল রাজাকে দেখে—"এসেছিস হতভাগা? এসেছিস? আজ তোর হাড়-মাস আলাদা করে ছাড়ব। এত দেরি এইটুকু পথ আসতে? আমি যে কতক্ষণ হল এসে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি—না তুই, না তোর মা বোনেরা, ওদিকে পেছনে—"

পেছনে পুলিস—এই কথাটা বলতে গিয়েই জন ক্যান্টি সময় থাকতে নিজেকে থামিয়ে ফেলেছে। পুলিস তাকে খুঁজছে, একথাটা এই প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ঘোষণা করা চরম নির্বুদ্ধিতা হত।

কথা বন্ধ করে সে ছুটে এল রাজাকে পাকড়াও করতে। তাকে বাধা দিল মাইলস্ হেণ্ডন "আরে বাবা, অত ব্যস্ত কিসের জন্যে? কাকে ধরতে যাচ্ছ? ও তোমার কে হয়?"

জন ক্যান্টি দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে নিল লোকটার দিকে। হুঁ, লোকটা দুর্বল নয় বলে বোধ হচ্ছে, তার ওপরে কোমরে অ্যায়সা লম্বা তরোয়াল আবার! এরকম মানুষের সঙ্গে হঠাৎ ঝগড়া বিবাদ বাধানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়—এটা জন ক্যান্টির বিলক্ষণ হুঁশ আছে। সে মেজাজ একটু মোলায়েম করার চেষ্টা করতে

করতে বলল—"বাপ-ব্যাটার কথার মধ্যে কথা কইতে আসা বাইরের লোকের উচিত নয়। ও আমার ছেলে।"

সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ এল রাজার কাছ থেকে—"না. কক্ষনো না। একদম মিথ্যে কথা। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সত্যি কথা বলতে কি আজ এই বিকেলবেলার আগে ওকে আমি চোখেও দেখি নি। তারপর আমি ওর খপ্পরে পড়েছিলাম, ও তার সুযোগ নিয়ে যা অত্যাচার করেছে এই রাজদেহের ওপরে—"

ক্রোধে ক্ষোভে রাজার কণ্ঠ রোধ হল। আর ওদিকে জন ক্যান্টি হয়ে উঠল অগ্নি অবতার। সে তেড়ে এল হাত বাড়িয়ে, হয়ত চুলের মুঠি ধরে বেয়াড়া ছেলেটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতলব। বাধা দিল মাইলস্ হেণ্ডন—ঝনাত করে বার করল দীর্ঘ তরবারি, ক্যান্টির বুকের দিকে তার ডগা উঁচিয়ে ধরে বলল—"খবরদার। আর এক পা এগিয়ো না এর দিকে। তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর হলেই বা হত কী? বাপও যদি অত্যাচারী হয়. ছেলেকে তার কাছে ঠেলে দেবার মত শিক্ষা-দীক্ষা মাইলস্ হেণ্ডনের নয়। আর তুমি যে দানবের মত অত্যাচারী, তা তো তোমার কথাতেই প্রকাশ। তুমি এইমাত্র আমার সম্মুখেই বলছিলে যে এর হাড়-মাস আলাদা করে ফেলবে।"

আড়াই হাত লম্বা তরোয়ালের সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস জন ক্যান্টির থাকবার কথা নয়, সে ধীরে ধীরে পিছু হটল। অবশ্য একেবারে নীরবে নয়, বিড়বিড় করে শাসাতে শাসাতেই পিছু হটল দুশমন। কিন্তু সেদিকে কান দেওয়ার কোন প্রয়োজন বুঝল না মাইলস্। সে রাজাকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল তার তেতলার ঘরে।

ছোট্ট একটুখানি খুপরি, তার একপাশে একটা ছোট বিছানা, আর একদিকে একটা ছোট টেবিল ও দুইখানা নড়বড়ে চেয়ার।

একটা জলের গামলাও রয়েছে কোণের দিকে, ব্যস্, এ ছাড়া অন্য কোন আসবাব নেই।

কিন্তু আসবাবের দৈন্য নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তখন রাজার নয়, তিনি ঘরে ঢুকেই বিছানায় অঙ্গ ঢেলে দিলেন। বিছানার মালিকের অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন বুঝলেন না। মাইলস্ অবাক্ হওয়ারও সুযোগ পেল না। তার আগেই রাজা গভীর নিদ্রায় অচেতন। অভাগা বালক! সকাল থেকে এই শেষ রাত পর্যন্ত কী দারুণ নির্যাতনই না গিয়েছে তার আরামে-লালিত রাজদেহের ওপর দিয়ে।

যাক, রাজা তো ঘুমোলেন, মাইলস্ ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাঁকে কিছু খাওয়াবার জন্য। অন্যদিন এই তৃতীয় প্রহর রাত্রে এই সামান্য সরাইখানাতে কোন খাদ্য নিশ্চয়ই পাওয়া যেত না, কিন্তু আজকের রাতের কথা একেবারেই আলাদা। সারা লণ্ডন শহর ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে স্ফূর্তি করবার জন্যে, দু'পয়সা রোজগার করবার এই তো সময় হোটেলওয়ালাদের। তাই খাওয়াব ব্যবস্থা রয়েছে, এবং মাইলস্ আদেশ পাঠানো মাত্র, তারা তা তামিল করবার চেষ্টায় লেগে গেল।

রাজার গায়ে কিছু নেই, শীতে তিনি থেকে থেকে কেঁপে উঠছেন। মাইলস্ তা লক্ষ্য করছে। বিছানার ভেতরে অবশ্য গায়ে চাপা দেওয়ার মত কিছু চাদর-টাদর ছিল, কিন্তু সবসুদ্ধ চেপে তো রাজাই শুয়ে আছেন। তাঁকে ঘুম থেকে না তুলে সে সব কিছু বার করা সম্ভব নয়। অন্য কোথাও কিছু আছে কি? মাইলস্ চারদিকে তাকাতে লাগল। নাঃ, কিছু নেই কোথাও। মাইলস্ তখন নিজের আঙরাখাটা খুলে ফেলল গা থেকে, আর তাই দিয়ে রাজাকে ঢেকে দিল। নিজে? নিজে দ্রুত পায়চারি করতে লাগল, যাতে রক্ত-চলাচল থেমে না যায় দারুণ ঠাণ্ডায়। মনকে প্রবোধ দিল এই বলে—"আমার এতে কী আসে যায়? দীর্ঘ সাত বৎসর প্রবাসে কাটিয়েছি।

বেশির ভাগ সময়ই গায়ে দেওয়ার কাপড় আমার ছিল না। আর জার্মানির সে ঠাণ্ডা তার কাছে লণ্ডনের ঠাণ্ডা ছেলেমানুষ একেবারে!"

অবশেষে খাবার এল। তু'খানা প্লেটে খাবার ঢেলে দিয়ে চাপা দিল খানসামা। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। এসব সস্তা-খদ্দেরের খাওয়ার সময়ে উপস্থিত থাকা তাদের রেওয়াজ নেই।

রাজার গায়ে আস্তে করে নাড়া দিতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই লক্ষ্য করলেন—গায়ে একটা আঙরাখা চাপা রয়েছে। আঙরাখাটা যে মাইলসের, তা বুঝতে দেরি হল না, কারণ মাইলস্ খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা নীরবে কতখানি স্বার্থত্যাগ করেছে, তা বুঝতে কষ্ট হল কেন রাজার? তাঁর মনটা খুবই নরম হয়ে পড়ল মাইলসের প্রতি।

মাইলস্ বলল—"খাবার তৈরী!"

রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"মুখহাত ধোব, জল ঢেলে দাও।"

হেণ্ডন চমৎকৃত! ভিখারী ছেলেটা ঠিক যে রাজার মতই হুকুম চালায়! ওর পাগলামির ভেতর শৃঙ্খলা আছে তো!

মাইলস্ অবাক্ হচ্ছে, রাজা অসহিষ্ণু হচ্ছেন। "কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জলের জন্যে?"—প্রশ্নটা বেরুলো সেই সুরে, যে সুরে ওয়েস্টমিনিস্টার প্রাসাদের ভৃত্যদের শাসন করেছেন কাল পর্যন্ত।

মাইলসের ভীষণ হাসি পাচ্ছে, কিন্তু রাজাকে সে এতই ভালবেসে ফেলেছে যে মুখের ওপর হেসে উঠে তাঁর মনে আঘাত দিতেও দ্বিধা লাগছে। তাই মুখের হাসি মুখে চেপে রাজার হাতে জল ঢালতে শুরু করল সে।

"এইবার তোয়ালে!" হুকুম এল রাজার।

রাজার নাকের সমুখেই একখানা তোয়ালে ঝুলছে দড়ি থেকে, তবু মাইলস্‌কেই সেটা পেড়ে নিয়ে রাজার হাতে দিতে হল।

আর বাক্যব্যয় না করে রাজা চেয়ার টেনে নিয়ে খেতে বসে গেলেন। অন্য চেয়ারখানা নিয়ে এবার মাইলস্‌ও টেবিলে বসতে যাচ্ছে, রাজা হঠাৎ খেপে উঠলেন— "কী! রাজার সমুখে তুমি আসন গ্রহণ করবে?"

মাইলস্‌ হেণ্ডন একলাফে তিন হাত পিছিয়ে এল। বাপ্‌! বাঘের বাচ্চা, পাগল? তা হোক পাগল। এ পাগলামির একটা মহিমা আছে। তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, এমন লোক আছে অবশ্যই, কিন্তু মাইলস্‌ সে দলের নয়! সে পিছিয়ে এসে রাজার চেয়ারের পেছনে বিনীতভাবে দাঁড়াল, যেভাবে খাওয়ার সময় রাজা-রাজপুত্রদের পেছনে খানসামারা দাঁড়ায়।

রাজা খেয়ে যাচ্ছেন। সামান্যই আয়োজন। কিন্তু রাজা পুরো একটা দিনই উপবাসী, যা খাচ্ছেন, তাই সুস্বাদু লাগছে। তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ প্রসন্ন হয়ে আসছে, মুখ ফিরিয়ে মাইলস্‌কে বললেন —"তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। রাজা একথা ভুলবেন না। একদিন এর পুরস্কার পাবে। কিন্তু তুমি কে? সম্ভ্রান্ত বংশের লোক বলেই তো তোমাকে মনে হয়!"

"তা বলতে পারেন রাজা!" মাইলস্‌ এই প্রথম রাজাকে রাজা বলে সম্বোধন করল। যা করতে হবে, তা পুরোপুরিই করা ভাল। রাজার মতই যে খাটিয়ে নিচ্ছে, তাকে রাজা বলে ডাকতে দোষ কী।

"তা বলতে পারেন বই কি! লর্ড শ্রেণীর নই যদিও, তবু আমার বাবার "সার" উপাধি আছে। ছোটখাটো একটা জমিদার তিনি। সার রিচার্ড হেণ্ডন।"

"নামটা শুনেছি বলে মনে হয় না। তোমার বাবা রাজদরবারে আসেন না বোধ হয়?"

প্রশ্নটা হকচকিয়ে দেয় মাইলস্‌কে।

"হ্যাঁ, না, মানে আমিই তো সাত বছর দেশ ছাড়া। তার আগে তিনি মাঝে মাঝে রাজসভায় আসতেন, মনে পড়ে। ইদানীং, তাঁর স্বাস্থ্য তখনই ভেঙেছিল, হয়ত এখন আর আসবার সামর্থ্য তাঁর নেই! কিংবা হয়ত তিনি আর নেই" বলতে বলতে গলা ধরে আসে মাইলসের।

রাজা সান্ত্বনা দেয় "ভালটার আশাই করা যাক। তিনি হয়ত ভালই আছেন। তুমি আগে থাকতে দুশ্চিন্তা কোরো না। কিন্তু সাত বছর দেশছাড়া কেন? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"মধ্য ইউরোপে যুদ্ধে। স্বেচ্ছায় যাই নি, ভাই হিউ চক্রান্ত করে পাঠিয়েছিল আমাকে।"

"বটে। তোমার পারিবারিক ইতিহাস বলতে যদি আপত্তি না থাকে, বলতে পার আমাকে। তোমার উপকার এই মুহূর্তে কিছু নাও করতে পারি যদি, একদিন নিশ্চয়ই পারব! রাজার সেবা যে করে, রাজার অনুগ্রহ তার প্রাপ্য।"

বাপ! কী আকাশছোঁয়া হামবড়াই। মাইলস্‌ হাসতে পারে না। একান্ত বাধ্য ভৃত্যের মতই রাজাজ্ঞা পালন করে। বলে যায় নিজের কথা।

"খুব বেশী দীর্ঘ কাহিনী নয়। মাকে হারিয়েছি আমার বাল্যেই। পিতা এবং আমরা তিন ভাই, আর আমাদের দূর সম্পর্কের ভগ্নী এডিথ এই নিয়ে সংসার। আমার বড় ভাই আর্থার ঠিক বাবার মতই উদার, মহাপ্রাণ। কিন্তু হিউ আবার অন্য ধরনের। আর্থারের স্বাস্থ্য ছেলেবেলা থেকেই খারাপ, সে যদি না বাঁচে, এবং আমাকেও যদি পথ থেকে কোন গতিকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে পিতার অবর্তমানে জমিদারিটা হিউয়েরই হতে পারে। আর্থারের সম্বন্ধে সে কোন ফন্দি আঁটছিল কিনা, জানি না, কিন্তু আমার

সর্বনাশ করবার জন্যে সে যে দারুণ ষড়যন্ত্র করেছে, তার পরিচয় শীঘ্রই পেলাম।

আমাদের দূরসম্পর্কের ভগ্নী এডিথ ছিল খুব বড়লোকের মেয়ে। মাতাপিতা ওর শৈশবেই মারা যান, তাই আমার বাবা হন ওর অভিভাবক। এডিথ বিবাহ করতে চায় আমাকে, কিন্তু হিউ চায় বিঘ্ন ঘটাতে। এডিথের অত অর্থ যখন, তখন অর্থের লোভেই হিউ তাকে আপন করে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! এখন এই এডিথকে উপলক্ষ করেই সে আমার সর্বনাশ ঘটাল। আমার ঘর থেকে একদিন বার করল একটা দড়ির সিঁড়ি। বাবাকে বোঝাল—দড়ির সিঁড়ি বেয়ে এডিথের ঘরে ঢুকে তাকে নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে যাওয়ার মতলব করেছি আমি।

পিতাদের স্নেহ বুঝি ছোট ছেলেদের ওপরেই সবচেয়ে বেশী হয় চিরদিন। হিউ ছিল আমাদের ভেতর বাবার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। আমি যে সত্যসত্যই একটা দুর্বৃত্ত, পিতার মনে এ বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা হিউয়ের পক্ষে শক্ত হল না। পিতা আমাকে আদেশ করলেন—"জার্মানিতে যুদ্ধ বেধেছে, সেইখানে যাও।" যতই অন্যায় হোক, পিতৃ-আজ্ঞা অমান্য করবার মত দুর্মতি আমার ছিল না। আমি জার্মানি চলে গেলাম। সে আজ সাত বছর হল।"

"সা-ত বছর?"—রাজা যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—"আমি যতদূর জানি, জার্মানিতে তো তিন বছর হল কোন যুদ্ধবিগ্রহ নেই!"

মাইলসের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। সত্যিই তিন বছর হল বন্ধ হয়েছে জার্মানির যুদ্ধ। সে খবর এ জানে কোথা থেকে? সত্যিই যে এ ভিখারী বালক নয়, তার আর একটা প্রমাণ এই!

"মহারাজ ঠিকই বলেছেন!"—পূর্ববৎ বিনয়ের অভিনয় করে যায় মাইলস—"যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে তিন বছরই হল বটে। চার বছর ধরে

অসংখ্য যুদ্ধে অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলাম, কর্নেল পদও জুটেছিল ভাগ্যে, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, শান্তি স্থাপন হবে হবে এমন সময় বিপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে গেলাম। ওদেশের আগাগোড়া ব্যাপারটা গোলমেলে; শান্তি এল, কিন্তু আমরা কয়েকজন বন্দীশিবির থেকে খালাস পেলাম না। দীর্ঘ তিন বৎসর সেই কারাগারে। অবশেষে স্রেফ নিজের বুদ্ধিবলে মুক্তিটা আদায় করলাম শত্রুর হাত থেকে, তারপরেই ছুটে আসছি নিজের দেশে। কালই সবে এসেছি লণ্ডনে। এইবার নিজের দেশে যাব, পিতা ভ্রাতাদের জন্য বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে, সাত বছর কোন খবরই পাইনি তাদের।"

রাজার খাওয়া এতক্ষণে শেষ হয়েছে, কী যেন গভীর ভাবে চিন্তা করছেন তিনি। অবশেষে তিনি যা বললেন, তাতে আশ্চর্য হয়ে গেল মাইলস্। রাজা বললেন—"তুমি সত্যিকার রাজভক্ত। যে দুর্দিনে ইংলণ্ডের রাজাকে রাজা বলে কেউ চিনতে পারছে না, একটা প্রতারক এসে পরম দুঃসাহসে অধিকার করে বসেছে রাজসিংহাসন ও রাজ-মর্যাদা, তখন একা তুমি চিনতে পেরেছ তোমার রাজাকে, নিজের মাথায় অজস্র বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একা তুমিই দাঁড়িয়েছ অবিশ্বাসীদের আক্রমণ থেকে তোমার রাজাকে রক্ষা করতে। এ রাজভক্তির যোগ্য স্বীকৃতি পাবে। অ-পুরস্কৃত থাকবে না তোমার মত বীরপুরুষ! আজ হয়ত এই মুহূর্তেই এ পুরস্কারের প্রকৃত মূল্য তোমার চোখে প্রত্যক্ষ না হতে পারে, কিন্তু চন্দ্রসূর্য উঠছে, স্বর্গে ভগবান আছেন, সে মূল্য তোমার আয়ত্তে আসবেই একদিন। এখন বল—তোমার রাজার কাছে কী তোমার প্রার্থনা! যা তুমি চাইবে, তাই পাবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমায়।"

মাইলসের প্রথম মনে হল—সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে পুরস্কারের প্রস্তাবকে সে তক্ষুনি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চমৎকার একটা কথা মাথায় এল তার। সে একেবারে বিনয়ে বিগলিত হয়ে নিবেদন করল—"মহারাজ যখন স্বেচ্ছায় দীন ভৃত্যকে পুরস্কার দিতে

তাদের পাশ দিয়ে ছুটে অশ্বারোহী দল

চাইছেন—পুরস্কারের অযোগ্য হয়েও সে প্রার্থনা করছে যে রাজার সম্মুখে আসন গ্রহণ করবার অধিকার তাকে দেওয়া হোক এবং তার পরে তার বংশধরদিগকে। সারা ইংলণ্ডে ডি-কুসী পরিবারই একমাত্র পরিবার—যারা রাজার সম্মুখে মাথায় টুপি রাখতে পারে। আমি চাই যে হেণ্ডনবংশই হোক একমাত্র বংশ—যারা রাজার সম্মুখে বসতে পারবে।”

এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে রাজা সবিস্ময়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন মাইলসের পানে, তারপরে বললেন—“এই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তাই হোক। বসো, জানু পেতে বসো।”

কী যে জাদু আছে রাজার কণ্ঠস্বরে আর চোখের ভঙ্গীতে, বিশ্বাস না করেও হেণ্ডন ঝটিতি মাটিতে বসে পড়ল জানু পেতে। তারই তরোয়াল ছিল দেওয়ালে হেলান দেওয়া, তাই তুলে রাজা তার কাঁধে স্পর্শ করালেন, এবং গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন—“ওঠো সার মাইল্‌স্ হেণ্ডন, তোমার রাজভক্তি ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে নাইট পদবীতে উন্নীত করলাম। তোমার অন্য বাসনাও পূর্ণ হোক. রাজসম্মুখে আসন গ্রহণ করবার অনুমতি, তাও তোমাকে প্রদান করছি আমি।”

রাজার প্রসারিত হস্ত চুম্বন করে রাজভক্তি নিবেদন করল মাইলস্, এবং তারপর উঠেই দ্বিতীয় চেয়ারখানা টেনে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা তার টনটন করছিল। ওঃ, কী সুবুদ্ধিই এসেছিল মাথায়! রাজার পুরস্কার তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করলে কতদিন আর বসতে পারা যেত না, তা কে জানে?

রাজা ততক্ষণে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন আবার। রাত আর বেশী নেই, ঘুমোনো দরকার। টেবিলে খাবার তখনও যথেষ্ট রয়েছে, মাইলস্ বসে বসে তারই সদ্ব্যবহার করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর শোয়া? রাজা বলেই দিয়েছেন, “তুমি দরজা আগলে মেঝেতে শোবে, আমাকে পাহারা দেবার জন্য।”

সকালবেলায় মাইলসের যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখনও রাজা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। মাইলস্ তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করল না। আহা! বেচারা বালক। কী গভীর নির্যাতনই না গিয়েছে ওর ওপর দিয়ে। সে নির্যাতনের সামান্য একটু অংশই সে প্রত্যক্ষ করেছিল গিল্ডহলের সম্মুখে। না জানি তার আগে কত ক্ষুধার জ্বালা, কত প্রহারের বেদনা ওকে সহ্য করতে হয়েছে সহানুভূতিশূন্য নিষ্ঠুরদের কাছ থেকে! অথচ ওর অপরাধ? অপরাধ এই যে ওর মাথা একটু খারাপ। সে তো বিধাতার অভিশাপ। তার ওপরে ওর হাত কী?

অথচ এই মাথা খারাপ ছেলেটির ভেতরে ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের সম্ভাবনা রয়েছে, তা স্পষ্ট অনুভব করেছে মাইলস্ হেণ্ডন। ওর কথাবার্তা সাধারণ স্তরের নয়, ওর ভ্রূভঙ্গীতে রাজমহিমা প্রকট হয়ে ওঠে। যদি ওর ওই মস্তিষ্কের ব্যাধিটা আরাম করে দেওয়া যায়, ও একটা মানুষের মত মানুষ হবে। মাইলস্ করবে তা। নিজের দেশে ওকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করবে ওর। সেখানে মাইলসের অর্থাভাব হবে না। ছেলেটার জন্য যা কিছু করা দরকার, তা ও করতে পারবে। সে চেষ্টা যদি সফল হয়। হবেই নিশ্চয়। ছেলেটা যদি দেশের ভেতর একটা গণ্যমান্য লোক হতে পারে ভবিষ্যতে, তখন মাইলসের সে কী আত্মপ্রসাদ! সে বুকে হাত দিয়ে স্বচ্ছন্দেই বলতে পারবে—"ভাঙ্গা কাচের পাত্রকে আমি অখণ্ড স্ফটিকপাত্রে পরিণত করেছি। আমার চেষ্টা সফল হয়েছে।"

রাজার গায়ে চাদর চাপা রয়েছে। অতি সাবধানে সেই চাদরের এক একটা পাশ মাইলস্ উঁচু করে ধরছে আর দড়ি দিয়ে মাপছে রাজার হাত, পা, কবজি, গলা। রাজার পরিধানের পোশাকটা শতছিন্ন। মাইলস্ এখন গরিব কিন্তু গরিব ভদ্রলোকের চোখেও সে পোশাক অসহনীয়। মাইলস্ একটা পোশাক কিনবে রাজার জন্য। নতুন কিনবার পয়সা তার আপাততঃ নেই, কিনবে পুরোনোই। তা

পুরোনো পোশাকের দোকানেও এমন জিনিস পাওয়া যায়, যা একটু-আধটু মেরামত করে নিলে নতুনের মতনই দেখাবে।

মাপজোপ নিয়ে মাইলস্ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফিরে এল ঘণ্টাখানেক বাদে। ঠিক পছন্দমত জিনিসটি পেতে তাকে অনেক ঘুরতে হয়েছে। এখানে একটা পাজামা পাওয়া গেল যদি, শার্টের জন্য যেতে হল আরও অনেকটা এগিয়ে। জুতো আছে, মোজা আছে—প্রত্যেকটাই চাই মাইলসের, আর প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা দোকান।

শেষকালে সব কিছু সংগ্রহ করে মাইলস্ যখন ঘরে ফিরল, তখনও রাজা ঘুমোচ্ছেন। তা ঘুমোন। যতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যায়, নিন। আবার তো হাঁটা শুরু করতে হবে। মাইলসের দেশ এখান থেকে কম দূর নয় নিতান্ত। না, হাঁটানোই বা কেন ছেলেটাকে। মাইলস্ পকেট থেকে টাকাপয়সা বার করে হিসাব করল একটা। এই তো! এখানকার ঘরভাড়া—মায় প্রাতরাশ পর্যন্ত হিসাব মিটিয়ে (যে প্রাতরাশ এখনও খাওয়া হয়নি) তবু যা অর্থ থাকে মাইলসের পকেটে, তাতে দুজনের জন্য দুটো ঘোড়া না হোক, দুটো গাধা অনায়াসেই কেনা যায়। গাধাতেও তো চড়ে অনেক ভদ্রলোক।

আপাততঃ রাজা ওঠেন নি এখন, মাইলস্ খানসামাকে ডেকে হুকুম দিল—"আধ ঘণ্টা বাদে প্রাতরাশ আনবে।" তারপর নতুন কেনা পুরোনো পোশাকগুলো পরীক্ষা করতে বসল। দুই এক জায়গায় সেলাই-টেলাই খুলে গিয়েছে, মেরামত করবার জন্য ছুঁচ সুতো সে কিনেই এনেছিল। এখন খাঁটি হয়ে বসে সে ছুঁচে সুতো পরাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে কাজ কি পুরুষের পক্ষে সহজ? সুতোটা একবার ছুঁচের ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একবার বা দিক দিয়ে। তবু, বিরক্তি নেই মাইলসের, মন তার প্রফুল্ল, সে একটা সৎকাজ হাতে নিয়েছে, এক নিরাশ্রয় উন্মাদ বালকের রক্ষণাবেক্ষণ। তারই দরুন আত্মপ্রসাদে তার অন্তর পূর্ণ।

বড় বড় সেলাই দিয়ে সে জামা মেরামত করে তুলল। এ সেলাইয়ের পাশে দরজীর খুদে খুদে ফোঁড়গুলোকে কী দীনদরিদ্রের মত যে দেখাচ্ছে! আপন মনে হেসেই ফেলল মাইলস্ হেণ্ডন।

কিন্তু রাজা উঠছেন না। এবারে ডেকে তুলতে হয়। কারণ প্রাতরাশ এনে রেখে গিয়েছে খানসামা। খিদেও পেয়েছে মাইলসের। সে "মহারাজ, মহারাজ" বলে ডাকল দুই একবার। স্বর ক্রমশঃ চড়িয়ে চড়িয়ে সে এখন চিৎকার শুরু করেছে প্রায়। কিন্তু এ কী ঘুম! এখনও সাড়া নেই রাজার দিক থেকে। অগত্যা বাধ্য হয়ে মাইলস্‌কে চরম ধৃষ্টতার কাজ করতে হল, রাজার দেহ থেকে টেনে নিতে হল গায়ের চাদরখানা। তখনি তার মাথা বোঁ করে ঘুরে গেল—চাদরের নীচে তো রাজা নেই! বালিশগুলো এমনভাবে সাজিয়ে চাদর চাপা দেওয়া হয়েছে যে ওপর থেকে দেখলে মনে হবে একটা মানুষ শুয়ে আছে বিছানায়। কে এ কাজ করল? কে এভাবে ঠকাল মাইলস্‌কে? কোথায় গেল সেই অভাগা ছেলেটা? আবার কি কোন নতুন বিপদে পড়ল নাকি?

চেঁচিয়ে ডাকতেই খানসামা ওপরে এল। ছেলেটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, খানসামা দেখেছে ছেলেটাকে বেরিয়ে যেতে। না, একা যায় নি, এক যুবক এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—"কী আশ্চর্য! আপনার নাম করেই তো যুবকটি ডাকল তাকে। মাইলস হেণ্ডন তো নাম আপনার! কী আশ্চর্য! আপনি কিছুই জানেন না বলছেন? অথচ আমি স্পষ্ট শুনলাম আপনার নাম করে ডাকতেই—"

চক্রান্ত! এ সেই ক্যান্টি লোকটারই কারসাজি! যে রাজাকে দাবি করতে চায় নিজের ছেলে বলে। দলের কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে কৌশলে রাজাকে বার করে নিয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ কতদূর নিয়ে গেল, তার ঠিক কি?

"কোন্ দিকে গেল? কোন্ দিকে?"—ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে মাইলস্।

"সাউথওয়ার্কের দিকে।"—

মাইলস্ আর দাঁড়াল না। প্রাতরাশের খাবার টেবিলের ওপর পড়ে রইল। একটু আগে যে ক্ষুধা মাইলসের জঠরকে জ্বালিয়ে তুলেছিল, এখন তা একদম উবে গিয়েছে। হোটেলের পাওনা চুকিয়ে, নিজের আঙ্গরাখা ঘাড়ে ফেলে এবং রাজার জন্য সদ্যকেনা পুরোনো কাপড়ের বাণ্ডিলটা বগলে নিয়ে মাইলস্ ছুটে বেরুলো লণ্ডন ব্রিজের ও-মাথার দিকে—ওই দিকেই সাউথওয়ার্ক কিনা!

একে ওকে জিজ্ঞাসা করে। হ্যাঁ, কেউ কেউ দেখেছে বইকি! ছেঁড়া জামাপরা এক বালককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক যুবক। তাদের পেছনে দুশমন চেহারার একটা গুণ্ডা গোছের লোক। অনেকেই দেখেছে। তারা দেখিয়ে দিল সাউথওয়ার্কের দিকে পুল থেকে নেমে ওই লোক তিনটি গ্রামের ভেতরে চলে গিয়েছে।

যেতে হল মাইলস্‌কেও। নিজের ভাই হারিয়ে গেলেও অনেকে এমন আকুলিবিকুলি করে এদিকওদিক ছোটে না। যতদূর যায় লোকে বলে দেখেছে, তারা দেখেছে তিনটি লোককে একটি প্রৌঢ়, একটি যুবক, একটি বালক। প্রৌঢ় একটু পেছনে, যুবক আর বালক আগে আগে।

দূরে দূরে আরও দূরে। মাইলস্ ছুটেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল, কোন পাত্তা নেই। অবশেষে এক হোটেলে রাত্রির মত আশ্রয় নিল সে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে—রাজা যদি ওদের হাত থেকে মুক্তি না পেয়ে থাকে, তবে তাকে খুঁজে বার করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হবে। খোঁজ সে করবেই, কিন্তু আপাততঃ নিজের বাড়িতে একবার না গেলে তো চলছে না। সাত বৎসর পরে বিদেশ থেকে এসে পিতা ভ্রাতা কেমন আছেন, সে খোঁজ নিতে দেরী করা উচিত নয়। সেটা কর্তব্যের বিচ্যুতি হবে। সেখানে একবার গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করে, তারপর ফিরে আসা যেতে পারে রাজার জন্য। ফিরে সে আসবেই। দৃঢ় সংকল্প তার।

আরও একটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগে। রাজা যদি মুক্তিই পেয়ে থাকেন ওদের হাত থেকে, কোথায় তিনি যাবেন! নিশ্চয়ই মাইলসের সন্ধানে, কারণ মাইলস্ ভিন্ন তাঁর অন্য বন্ধু আপাততঃ নেই। আর মাইলসের সন্ধান করতে যদি তিনি যান—কেণ্ট অঞ্চলের দিকেই অবশ্য যাবেন তিনি। কারণ কেণ্ট যে মাইলসের দেশ তা তো তিনি শুনেছেন। সুতরাং লণ্ডন ও তার শহরতলির জনারণ্যের ভেতরে খুঁজে খুঁজে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। সে যেন হবে কতকটা খড়ের গাঁজায় ছুঁচ খুঁজে বেড়ানোর মত। তার চেয়ে দেশে যাওয়া যাক সেখানে গিয়ে যদি দেখা যায় যে রাজা ওখানে যান নি তখন ফিরে এসে—

অতএব মাইলস্ হেণ্ডন দেশের দিকে পা বাড়াল।

৬

রাজার বর্তমান অবস্থাটা এইবার তাহলে দেখে আসা যাক। হোটেলের খানসামা ঠিকই বলেছিল—একটা যুবক এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে মাইলস্ হেণ্ডনের নাম করে। যুবকের নাম হিউগো।

হিউগো এসে রাজাকে ঘুম থেকে তুলল যখন, রাজা বিরক্তই হলেন—"এত সকালে ডাকাডাকি কিসের জন্যে?"

হিউগোর তো তাক্ লেগে গেল। বেলা বাজে দশটা, এখনও বলে এত সকাল? এ কী নবাবপুত্তুর রে বাবা!

কিন্তু সে কথা কানে না তুলে হিউগো খুব ব্যস্তভাবে বলল—"মাইলস হেণ্ডনকে চেনো তো? মাইলস্ হেণ্ডন? সে খুব বিপদে পড়েছে, তোমার সাহায্য তার এক্ষুনি দরকার। সে আমায় পাঠিয়ে দিলে তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে।"

মাইলস্ হেণ্ডন বিপন্ন? দ্বিতীয় কথা আর বলতে হল না হিউগোকে। রাজা লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে,—"কোথায়? কী হয়েছে তার?" মুখ থেকে তাঁর প্রশ্নের পর প্রশ্ন বেরুচ্ছে, ওদিকে ত্বরিত হাতে পরে নিচ্ছেন ছিন্ন পোশাক, জামাজুতো, পাজামা।

ততক্ষণ হিউগো নিশ্চিন্ত নেই। বিছানার বালিশগুলো একটা বিশেষ ভঙ্গিতে সাজিয়ে, চাপা দিচ্ছে চাদর তার ওপরে, যাতে ওপর থেকে দেখলেই মনে হবে—রাজা আগের মত শয্যাতেই শুয়ে আছেন। রাজার দৃষ্টি পড়লই না সেদিকে।

তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়লেন—আগে আগে রাজা, পেছনে হিউগো। রাজা লক্ষ্য করলেন না যে তাঁরা দু'চার পা যেতে না যেতেই

কোথা থেকে আর একটা লোক এসে তাঁদের সঙ্গ নিল। সে পেছনেই রইল অবশ্য, কারণ রাজা তাকে দেখলেই চিনবেন, এবং সমস্ত ব্যাপারটাকেই সাজানো বলে ধরে ফেলবেন তৎক্ষণাৎ। বলা বাহুল্য সে জন ক্যান্টি।

হিউগো রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দূর থেকে আরও দূরে। পুল থেকে নেমে সাউথওয়ার্ক শহরতলিতে ঢুকছে। শহরতলিও পার হয়ে গেল। দূরে দেখা যায় অরণ্য। সেইদিকে হিউগোকে পা বাড়াতে দেখে, এই এতক্ষণে রাজার মনে যেন কেমন সন্দেহ হল। তিনি স্পষ্ট বললেন—"আমি আর যাব না, তুমি একটুখানি একটুখানি করে আমাকে অনেক দূর এনে ফেলেছ।"

হিউগো যেন খুব মর্মাহত হল বলল—"ওই বনের মধ্যে তোমার বন্ধু আহত হয়ে পড়ে আছে, আর এতদূর এসে তুমি ফিরে চলে যাবে।"

রাজা ধমক দিয়ে উঠলেন—"বন্ধু নয়। রাজাদের ভৃত্য থাকে, বন্ধু থাকে না। সে যা-ই হোক, মাইলস্ হেণ্ডন আহত, তা তো তুমি এতক্ষণ বল নি! ওই বনের ভেতর? চল, চল!"

রাজা দ্রুতপদে এগিয়ে চললেন। বনের ভেতর ঢুকে পড়লেন ক্রমে। কোথাও জনমনুষ্যের চিহ্ন নেই। আবার রাজার মনে সন্দেহ জাগছে। তিনি আবার রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে দেখা গেল একটা পরিত্যক্ত গোলাবাড়ি সেই অরণ্যের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। রাজা ভাবলেন - নিশ্চয় এইখানেই আছে হেণ্ডন, তিনি ছুটে গিয়ে প্রবেশ করলেন সেই ঘরে।

কিন্তু কই? কেউ তো নেই এখানেও! রাজা রেগে বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় একটা খলখল হাসি কানে এল তাঁর। চমকে মুখ তুলে দেখেন সম্মুখেই সেই দুর্বৃত্ত ক্যান্টি।

"তোকে নিয়ে আমার হায়রানির শেষ নেই। এইবারে মেরে যদি

তোকে শেষ না করি—!" বলেই শাসানিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য সে হাত বাড়াল।

বাধা দিল হিউগোই। বললে—"আঃ, কী দরকার ওসব করে? এনে যখন ফেলেছি, এখন তো ও আমাদের হাতে!"

প্রহার থেকে ক্যান্টি নিরস্ত হল বটে, কিন্তু চোখা চোখা বাক্যবাণ ছুঁড়তে থাকল ক্রমাগত "হরেকরকম পাগল দেখেছি বাবা, কিন্তু পাগলামির ঝোঁকে নিজেকে একেবারে রাজা বলে খোয়াব দেখা—এ বাপু একেবারে নতুন, বাহাদুরি আছে তোর! তা তার সে মা, ঠাকুরমা, বোন দুটো—এদের কোন খবর দিতে পারিস? না, রাজা হয়ে গরিব মা-বোনের কথা ভুলে মেরে দিয়েছিস?"

"আমার মা স্বর্গে। আর আমার বোনেরা সব রাজপ্রাসাদে।"

একটা অট্টহাসি ক্যান্টিতে আর হিউগোতে মিলে। রাজা রাগে গরগর করতে করতে তফাতে চলে গেলেন। গোলাঘরখানা মস্ত বড়। চালের তলায় একটা ছোটখাটো মাঠ যেন। সেইটের ওধারে একটা খড়ের গাদা চোখে পড়ে। এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এই দুটো শত্রুর সম্মুখ দিয়ে। পালাবার জন্যে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।

খড়ের গাদার ভেতরে ঢুকে পড়লেন রাজা। গায়ের ওপর পুরু করে খড় চাপা দিলেন। কী গরম! কী আরাম! দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম যখন ভাঙ্গল সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। চোখ মেলেই রাজা দেখেন মাঠের মত ফাঁকা জায়গাটাতে এক বিরাট আগুন জ্বলছে, আর সেই আগুনকে বেষ্টন করে আছে অন্ততঃ পঞ্চাশটা মানুষ। নারী ও পুরুষ দুইই আছে তাদের ভেতরে। নারীর ভেতরও আছে বুড়ি থেকে খুকী পর্যন্ত, পুরুষের ভেতর বুড়ো থেকে খোকা। তারপর—কানা, খোঁড়া, কুষ্ঠরোগী—কী নেই সে দলে? দুটো কুকুরও রয়েছে, শিকলে বাঁধা। এরা কানাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

আগুনে কী যেন রান্না হচ্ছে। ততক্ষণ মদ চলছে ঘন ঘন। অতি কড়া, অতি দুর্গন্ধ, সস্তা একটা পানীয়। তাই পাত্রের পর পাত্র গলায় ঢালছে প্রত্যেকে।

শুয়ে শুয়ে রাজা দেখছেন—এদের দলে দলপতি আছে একটা। তার বেশ ক্ষমতাও আছে, দেখা যায়। তার শাসন মাথা পেতে নিতে হয় সবাইকে। তাকে সম্বোধন করছে ওরা 'হামবড়া খুড়ো' বলে।

সেই হামবড়া হুকুম করল—"এইবারে কেউ গান ধর একটা।"

আদেশ অলঙ্ঘ্য। এক কানা, ঘোলাটে দৃষ্টিহীন তার চোখ, হঠাৎ চোখের ওপর থেকে একটা আটো পাতলা কাপড় টেনে তুলে ফেলল। অমনি অবাক্ কাণ্ড! বেরিয়ে পড়ল নিখুঁত দুটো জ্বলজ্বলে চক্ষুরত্ন। পাতলা কাপড়ে কানা-চোখ এঁকে অন্ধ সাজে ও। "কানাকে এক পেনি ভিক্ষা দাও গো"—বলে লোক ঠকিয়ে বেড়ায়।

এই কানা ধরল গান। সঙ্গে যোগ দিল এক খোঁড়া। কাঠের পা পরে দুই বগলে দুই লাঠি ধরে সে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এখন কাঠের পা খুলে ফেলে, কোঁকড়ানো নিজস্ব পা-খানাকে সে সোজা করে মাটিতে পাতল এবং গান শুধু নয়, গানের তালে তালে নাচও শুরু করে দিল।

এই সময়ে জন ক্যান্টি এসে হাত বাড়িয়ে দিল হামবড়া খুড়োর দিকে।

"আরে ক্যান্টি ভাই, তুমি কোথা থেকে এত কাল পরে? আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি ধরা পড়ে ফাঁসি-টাঁসি গিয়েছ।"

"ফাঁসি যাবার মত কাজ এতকাল করি নি হে হামবড়া! তবে এবারে করে ফেলেছি। তাই আবার শহর ছেড়ে পালিয়ে আসতে হল তোমার আশ্রয়ে। নইলে, শহরেই থেকে যাবার ইচ্ছা ছিল বরাবর। ওখানে কাজকর্মের সুবিধা অনেক।"

"সুবিধা না থাকলে আর তুমি সেখানে এতকাল টিকে থাকতে

পার ?” বলে হামবড়া—“কিন্তু ফাঁসি যাবার মত কাজ কি করলে এবারে ?”

“খুন”—

“বাঃ বাঃ”, হামবড়া তার পিঠ চাপড়াল— “খুন করলে কাকে ?”

“একটা পাদরীকে।”

“আরে বাহবা! বাহবা! তুমি তো বাহাদুর আছ! থাক তুমি আমাদের সাথে, আগের চাইতে অনেক বেশী খাতির পাবে দেখো!”

অন্ধ হঠাৎ গান থামিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল—“শুধু পাদরী খুন করলে একটা ? আইনকানুন যারা করে, আইন ভাঙলে কান কেটে দেয় যারা, সেই সব লোককে খুন করতে পারো নি ? তা যদি পারতে, তোমায় আমরা মাথায় করে নাচতাম।”

ক্যান্টি, কৌতুকের হাসি হেসে বলল—“কেন হে, আইনওয়ালাদের ওপর এত রাগ কেন হে তোমার ?”

“আইনই তো আমার এ দশা করেছে! এ-দলের সবাই জানে আমার আগের কথা। জানো না কেবল তুমি। তুমিও শোনো। আমার সব ছিল একদিন। আজ আর কিছু নেই। দশ বারো একর জমি ছিল—তাতে চাষ হত গম, যব, আলু। অঢেল খেতাম, খাওয়াতাম পরিজনদের, বিক্রি করে আরাম-বিরামের জিনিস কিনতাম। হঠাৎ আইন তৈরী হল দেশে, জমি সব রাজা খাস করে নিয়েছেন, সে জমিতে ভেড়া চরানো হবে। ভেড়ার পশম বিক্রিতে নাকি যথেষ্ট আয় হবে রাজার।

জমি আমার গেল! আমি শহরে গেলাম স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে। দিনমজুরি করি, কোনদিন খাওয়া জোটে, কোনদিন জোটে না। রোজ মজুর খাটাবে কে ? আর মজুরির উমেদার তো আমি একা নই! শত শত! যাদের জমিতে রাজার ভেড়া চরছে তারাই দোরে দোরে ঘুরছে মজুরির জন্য।

কাজ যখন জোটে না, তখন ভিক্ষে করতে হয়। তাতেও বাদ

সাধল আইনওয়ালারা। ভিক্ষে করা বেআইনী বলে ঘোষণা করল তারা। তবু পেটের দায়ে ভিক্ষে করি। ধরা পড়লাম যখন, বেত মারল পিঠে। এই দেখ, বেতের দাগ এখনো আমার পিঠে আছে।"

গায়ের ছেঁড়া জামাটা খুলে ফেলল লোকটা। সারা পিঠজোড়া লম্বা লম্বা দড়া দড়া দাগ। কত বছর হয়ে গেল, তবু মেলায় নি সে দাগ।

জামা পরতে পরতে নিজের গল্প ও বলে চলে—"প্রথমবার ধরা পড়লে বেত। দ্বিতীয় বার ধরা পড়লে এই দেখ—"

মাথার লম্বা চুল সরিয়ে লোকটা দেখাল—বাঁ কান যেখানে থাকবার কথা, সেখানে কান নেই। কান কেটে নেওয়াই হল রাজার আইনওয়ালাদের বিধান। দ্বিতীয়বার ধরা পড়তে বাঁ কান গেল, তৃতীয়বার ধরা পড়তে ডান কান! অবশেষে তাকে কপালে জ্বলন্ত লোহা দিয়ে ক্রুশের দাগ দেগে দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

এদিক থেকে ওদিকে যায়, এ-শহর থেকে ও-শহরে। সঙ্গে ফেরে এক পাল শিশু, রুগ্না স্ত্রী! একে একে সব গেল—কোনোটা মরে গেল, কোনোটা হারিয়ে গেল। যখন আর কেউ রইল না, কানকাটা, কপালে দাগ-দেওয়া পুরোনো পাপীকে দেখা মাত্র লোকে দূর দূর করে তাড়া করতে লাগল। তখন একদিন সে হামবড়া-খুড়োর এই দলে ভিড়ে পড়ল।

"ওই ভেড়া-চরানো আইন! আমার মত কত লোকের ভিটেতে যে ওই আইন ঘুঘু চরিয়েছে, তার লেখাজোখা নেই।"—বলে লোকটা তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল একেবারে।

"ও-আইন আজ থেকেই রদ হল"—

কে বলল এ কথা? কোথা থেকে বলল? প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের পানে তাকায়।

ওই যে! খড়ের গাদার ভেতর থেকে উঠে আসছে একটা ক্ষুদ্র বালক নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরা। সে আবারও বলছে এদিকে আসতে আসতে—"আজ থেকেই আমি ও নারকীয় আইন রদ করে দিলাম।"

একটা অট্টহাসি উঠল গোটা দলটার ভেতর থেকে।

হামবড়া বলল—"এ ছোঁড়াকে তো আগে দেখি নি! কোথা থেকে এল? পাগল নাকি?"

"না, পাগল নই। আমি ষষ্ঠ এডোয়ার্ড! ইংলণ্ডের রাজা!"

আবার সেই অট্টহাসি।

ক্যাণ্টি লাফিয়ে এসে ধরল রাজাকে—"আবার তুই সেই কথা বলছিস? নিষেধ করলে তবু শুনবি না?"—প্রকাণ্ড এক ঘুষি তুলল ক্যাণ্টি রাজাকে লক্ষ্য করে।

তাকে বাধা দিল হামবড়া। ক্যাণ্টির হাতখানা ধরে ফেলে তিরস্কারের সুরে বললে—"এ দলে কাউকে সাজা দিতে হলে আমিই দিই!"

"কিন্তু ও তো আমার ছেলে!" গর্জে ওঠে ক্যাণ্টি।

"না, কক্ষনো না। আমি রাজা! রাজা এডোয়ার্ড!"

হামবড়ার মুখে মোলায়েম কথা—এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে; সে রাজাকে বলল— 'ছিঃ বাছা, রাজার নাম করে তামাশা করতে নেই। আমরা ভিখারী, তাতে ভুল নেই। ছোটখাটো চুরি-চামারিও আমরা না করি, তাও নয়। কিন্তু সে শুধু পেটের দায়ে। রাজার ওপর আমাদের ভক্তি অটুট। রাগ যা কিছু, সে ওই তাদের ওপর, যারা যা-তা আইন করে প্রজাদের সর্বনাশ করে। দেখবে সত্যি সত্যি আমরা রাজভক্ত কিনা?"

এই বলেই হামবড়া হাত তুলে জয়ধ্বনি করে উঠল—"জয় মহারাজ ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের জয়!"

সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিখারীর দল— নানা বয়সী নানা বেশী নারী-

পুরুষ-বৃদ্ধ বালকের সেই বিচিত্র ভিড় এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—"জয় মহারাজ ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের জয়।"

আর রাজা? অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন—"ভক্ত প্রজাবৃন্দ! তোমাদের মঙ্গল হোক!"

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আকাশ ফাটানো হাসি।

* * *

পরের দিন ভোরেই দলটা ছড়িয়ে পড়ল রুজি-রোজগারের চেষ্টায়। কানা চোখ আঁকা কাপড় দুচোখে এঁটে কেউ কানা সাজল, সুস্থ সবল পা গুটিয়ে তুলে তার নীচে কেউ খোঁড়ার কাঠের পা পরে লাঠি-বগলে পথ চলতে লাগল। যা হোক করে কিছু বাগিয়ে আনতে হবে লোকের কাছ থেকে।

হামবড়ার হুকুমে হিউগো ভার নিল রাজার। কাজ শেখাবে সে। ভিক্ষে দিয়ে শুরু। তারপর চুরির হাতেখড়ি যথাসময়ে।

ভিক্ষে করা বেআইনী। কিন্তু সাহস করে, কায়দা করে চাইতে পারলে ভিক্ষে পাওয়া যায়। এমন দয়ালু লোক আছে, যারা আইনভঙ্গ করেও দীনদুঃখীকে দান করতে ইচ্ছুক। লোক চিনে চাইতে হবে, চেঁচিয়ে উঠে ধরিয়ে না দেয়। জায়গা বুঝে চাইতে হবে, বেকায়দা দেখলে যাতে ছুটে পালানো যায়।

হিউগো বেরুলো রাজাকে সঙ্গে নিয়ে। রাজা বেরুতে আপত্তি করলেন না। কারণ, গোটা দলটার ভেতর থেকে পালানো শক্ত, কিন্তু একা হিউগোর কবল থেকে, খোলা মাঠের ভেতর, পালাবার অনেক সুযোগ মিলতে পারে।

হামবড়ার কঠোর নির্দেশে ক্যান্টি আর ঘেঁষছে না রাজার কাছে। দলপতির হুকুম না মানলে এ-দলে আশ্রয় পাওয়া যাবে না, অথচ সে-আশ্রয় এখন ক্যান্টির নিতান্ত দরকার। পেছনে পুলিস রয়েছে কিনা!

হিউগো চলল অদূরবর্তী এক ছোট শহরের দিকে। তখনও

আশেপাশে ভিখারীদলের অন্য লোকেরা রয়েছে, রাজা হঠাৎ পালাবার চেষ্টা করতে সাহস পাচ্ছেন না।

ক্রমে এরা দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল দল থেকে। শহর সম্মুখেই। একটা গলিপথ, তার দুদিকেই উঁচু বেড়া। বেড়ার ওধারে মাঠে নানারকমের ফসলের চাষ। সেই গলিপথ বেয়ে হিউগো শহরের পানে এগুচ্ছে। ধীরে পথ চলছে, ঘন ঘন পেছনে তাকাচ্ছে। পেছন থেকে কী ধরনের লোক আসে, দেখা দরকার। পুলিসও আসতে পারে তো!

না, আসছে একটি আধবুড়ী স্ত্রীলোক, মাথায় একটা ঝুড়ি, তাতে চট দিয়ে জড়ানো লম্বা-মত কী যেন জিনিস একটা।

হিউগো তাড়াতাড়ি রাজাকে বলল—"দাঁও মিলেছে, বুঝলি? আমি চিৎপাত হয়ে পড়ছি এই রাস্তার মাঝখানে, হাত-পা খিঁচোচ্ছি। তুই চিৎকার করে কান্নাকাটি কর, বল্ যে আমার দাদার মৃগীরোগ হয়েছে। বুড়ীকে বলবি একটু হাওয়া করতে, অবশ্যি সে বোঝা নামিয়ে কাছে আসবে আমার। তুই অমনি বোঝাটা তুলে নিয়ে দিবি দৌড়!"

"কক্ষনো না!"—বলে রুখে উঠলেন রাজা। কিন্তু ততক্ষণে স্ত্রীলোকটি কাছে এসে পড়েছে, এবং হিউগো মাটিতে পড়ে গোঁগোঁ করছে। কী তার হাত-পা ছোঁড়ার বহর, লাথি গুঁতো গায়ে না লাগে, এই জন্য রাজাকে সরে দাঁড়াতে হল।

হিউগো খিঁচুনির ফাঁকে ফাঁকে ফিসফিস করে গজরাচ্ছে—"চ্যাঁচা শিগগির! কেঁদে ওঠ, দাদা মরে গেল বলে।"

রাজা নড়েন না, চড়েন না। তিনি ভাবছেন, হিউগো মাটিতে পড়ে আছে, এই অবসরে টেনে দৌড় দিলে কেমন হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে মতলব তাঁকে ছাড়তে হল। কী জানি হিউগো কী বলবে তা হলে, পেছনের ওই বুড়ীকে তা কে জানে! হয়ত বলবে,—আমার টাকা চুরি করে পালাচ্ছে। চোর বলে হয়ত তাড়া করবে রাজাকে।

না, সে সব এখন নয়।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি এসে পড়েছে। হিউগো যখন দেখল রাজার দ্বারা কোন সাহায্য হচ্ছে না, তখন সে নিজের হাতেই খেল্‌টা তুলে নিল ষোল আনা। খিঁচুনির মাঝে মাঝে গোঙানি, এবং গোঙানির সুরেই কাতর আবেদন—"বুড়ী-মা, আমায় একটু সাহায্য কর, একটু হাওয়া কর বসে! মরে গেলাম আমি! ওই ভাইটা আমার—কী পাষাণ প্রাণ ওর, দেখছেন? আমি মরে যাচ্ছি, একটু হাওয়া করবে না কিছুতেই। ওঃ, দম আটকে যায় যে!"

নারী। তার নামও বুঝি দয়াবতী। আধবুড়ী স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি মাথার ঝুড়িটা নামিয়ে রাখল পথের পাশে, আর "তুমি কেমন ধারা ভাই হে বাছা!" রাজাকে এই বলে একবার তীব্র ভৎর্সনা করেই পথের পাশের বেড়ার কাছে গেল ঝাড়ালো একটা চারা গাছ থেকে চওড়া পাতাওয়ালা একখানা ডাল ভেঙে আনবার জন্য। তা নইলে, হাওয়া করবে কী দিয়ে?

হিউগোর এই সুযোগ! বুড়ী তার দিকে পেছন ফিরে ডাল ভাঙছে, সে এক লাফে উঠে ঝুড়ির ভেতর থেকে চট মোড়া জিনিসটা তুলে নিয়েই দে দৌড়। দৌড়টা শহরের দিকেই।

বুড়ী তার পায়ের শব্দ শুনেই ফিরে তাকিয়েছে। হাত-পা খিঁচোনো মৃগীরোগীকে বোঝা মাথায় করে দৌড়ে পালাতে দেখেই সে "চোর চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠেছে আর নিজেও দৌড়োতে শুরু করেছে হিউগোর পেছনে।

রাজা? রাজা যে কী করবেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। বুড়ী তাঁকে হিউগোর ভাই বলে জানে। সেই হিউগো চুরি করে পালাচ্ছে, কাজেই তিনি তার চোখে চোরের ভাই। দাঁড়িয়ে থাকলে ধরা পড়তেই হবে। তাঁরও পালানো দরকার। তিনি উলটো দিকে ছুটলেন, যেদিক থেকে বুড়ী এসেছে।

বুড়ীর গলার কী জোর! "চোর চোর" চিৎকার শোনা যাচ্ছে

খুব জোরে তার টুটি টিপে ধরল—

আধ মাইল পর্যন্ত। রাজা পালাচ্ছেন, আর শুনছেন সেই গলাবাজি। মনে হচ্ছে যেন বুড়ী তাঁর পেছনেই ধাওয়া করে আসছে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে।

খোঁড়া পা-ই গর্তে পড়ে। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই রাত। যেদিকে রাজা পালাচ্ছেন কয়েকজন লোক আসছে সেই দিক থেকেই। তারাও "চোর চোর" হাঁক শুনেছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ধাবমান পলাতককে দেখতে পেল। অমনি তারা তেড়ে এল, ধরে ফেলল রাজাকে।

হিউগো? সে বেড়া টপকে মাঠের ভেতর পড়েছে, ছুটতে ছুটতে মাঠ ভেঙে পালিয়েছে। বোঝাটা নিয়ে যেতে পারে নি। বেড়া ডিঙোবার আগে সেটা ফেলে গিয়েছে রাস্তায়।

পেছনের লোকগুলি রাজাকে ধরে এনেছে। বুড়ী রাজাকে সনাক্ত করল। এরা দুজন ছিল। এর ভাই-ই বোঝাটা নিয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু এও তার সঙ্গে ছিল।

ডাকাডাকি করে একজন পুলিস সিপাহী এনে ফেলল এরা। রাজাকে নিয়ে চলল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

কেউ লক্ষ্য করল না, ইতিমধ্যে নতুন আর একজন লোক এসে যোগ দিয়েছে ওদের ভিড়ের পেছনে। সে কোন কথা বলে নি, নীরবে সঙ্গ নিয়েছে এই মিছিলের। সে আর কেউ নয়, মাইলস্ হেণ্ডন।

* * * *

ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনলেন। লোকটির বয়স হয়েছে। বিবেচক এবং দয়ালু।

বাস্তবিক যে চোর, সে পালিয়েছে। কিন্তু এই বালকও চোর, কারণ পলাতকের সঙ্গে এও ছিল, এবং পলাতক যখন পালিয়ে গেল, এও চেষ্টায় ছিল পালাবার। বিচারক বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন— "তোমার ও বোঝাতে কী আছে?"

উত্তর হল—"আমার বোনের বাড়ী যাচ্ছি। বাড়িতে অনেক-

গুলো শুয়োরছানা খাওয়ার মত হয়েছে। তাই, একটাকে মেরে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার বাড়িতে।”

“ওটার দাম কত হবে?”

“দাম? তা একটা পাউণ্ড তো হবেই!”

“এঃ, তুমি তাহলে ছেলেটাকে ফাঁসিতেই লটকালে দেখছি।”

ফাঁসি! বুড়ী কেঁপে উঠল। এতটুকু একটা বালকের মৃত্যুর কারণ হবে সে? নরকেও ঠাঁই হবে না যে তার! সে জিজ্ঞাসা করল—“কেন হুজুর, সামান্য অপরাধ, এতে ফাঁসি কেন হবে?”

“অপরাধ সামান্য কী করে হল? চোরের সহকারী যে, সেও চোরই। আইন বলছে—ছিন্‌তাই-চুরির বামালের দাম যদি সাড়ে তের পেনি পর্যন্ত হয় তবে অপরাধীর কারাদণ্ড দিলেই চলবে। তার বেশী হলেই ফাঁসি।”

বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে—“তা কে বলছে যে ওই ছোট একটা শুয়োরছানার দাম সাড়ে তেরো পেনির বেশী? আমি অবশ্য বেচি টেচি না ওসব, নিজেদের ঘরেই কুলোয় না, তা বেচব কী! কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কেউ যদি আমাকে গোটা চারেক পেনি দিয়ে দিত, আমি ছালচামড়া সমেত তাকে শুয়োরটা দিয়ে দিতাম।”

“তাই বল, এখন তাহলে আমি ছেলেটাকে ছয় মাসের জেল দিয়ে দিতে পারি। ছেলেটাকে ফাঁসি থেকে বাঁচালে তুমি।”

রাজার ছয় মাসের জেল হল। এজলাসে এসে রাজা আর নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন নি হাকিমকে, কারণ ইতিমধ্যে মাইল্‌স্ হেণ্ডনের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়েছে, এবং চোখের ইশারায় সে রাজাকে ও বিষয় নিষেধ করে দিয়েছে! রাজার নৈরাশ্যের মাঝখানে এক ফালি আশার আলো এসে ঝিলিক দিয়েছে মাইলসের আকস্মিক আবির্ভাবে।

পথচারীরা যে যার পথে চলে গিয়েছে। পুলিসের সিপাহীটি

রাজাকে সঙ্গে নিয়ে জেলখানায় চলেছে। রাজার পেছনে আছে মাইলস্।

আর এদের সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটিও যাচ্ছে, তার শুয়োরছানা মাথায় নিয়ে। সিপাহী তাকে নিকটে ডাকল।

"তুমি এদিকে আসছ যে?"

"এই দিকেই আমার বোনের বাড়ি।"

"তা শুয়োরছানাটা আমায় বেচে যাও না!"

"না, বেচব কেন? বোনকে দেব বলে নিয়ে এসেছি!"

"ওটার দাম কিন্তু বাজারে এক পাউণ্ডই হয়।"

"তা ত হয়ই।"

"হয় যদি, তবে তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে বললে কেন যে ওর দাম সাড়ে তেরো পেনির বেশী হবে না।"

"কী করি, ছেলেটা মারা যায় যে!"

"হুঁ, ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলেছ?"

"অ্যাঁ? অ্যাঁ?"—বুড়ী ভয় পেতে শুরু করে।

"এ অপরাধে তোমারই এখন ফাঁসি হতে পারে, জানো?"

"অ্যাঁ? অ্যাঁ?" বুড়ী মূর্ছা যাবার দাখিল।

"ও হাকিমের ওপরও হাকিম আছে এই শহরে। আমি তার কাছে তোমায় হাজির করব। তোমার ফাঁসি হওয়াই দরকার। দেশে আইন আছে কী করতে?"

বুড়ী হাতে-পায়ে ধরতে লাগল সিপাহীর। শেষ পর্যন্ত সিপাহী দয়া করে রেহাই দিল তাকে। অবশ্য শুয়োরছানাটি সাড়ে তেরো পেনি দামেই সিপাহীকে বেচতে হল তার।

বুড়ী সাড়ে তেরো পেনি নিয়ে, বোঝা নামিয়ে দিল সিপাহীর সমুখে। তারপর সে ছলছল চোখে শূন্য হাতে বোনের বাড়ির দিকে চলে গেল।

শুয়োরছানাটাকে কাঁধে নিয়ে পথ চলছে সিপাহী। মাইলস্ এতক্ষণ একটু পেছনে ছিল। এইবার এগিয়ে এসে সিপাহীর সঙ্গ ধরল। কথা শুরু করল এইভাবে—"সিপাহী ভায়া খুব মুনাফা করলে তো?"

সিপাহী একটু অস্বস্তি বোধ করল! কয়েদী বালক সব কথা শুনে থাকে যদি, তাতে ক্ষতি নেই, কারণ কয়েদীর কথার দাম নেই। কিন্তু এই বাইরের লোকটা এ যদি সব শুনে থাকে আর প্রকাশ করে দেয়, তবে বিপদ হতে পারে। সে ওকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য বলল—"কয়েদীর সাথে সাথে যে পথ চলে, সে যে ভাল লোক, একথা আইন বিশ্বাস করে না। ভাগো এখনই, নইলে বিপদে পড়বে।"

"আমি বিপদে পড়ি যদি, সে তো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু তুমি যে বিপদে পড়েই আছ মশাই! এক পাউণ্ড যার দাম, জেনে শুনে সেই শুয়োরছানা তুমি সাড়ে তেরো পেনিতে বেচতে বাধ্য করেছ বুড়ীকে। একে জুলুমবাজিও বলা যায়, ঘুষ খাওয়াও বলা যায়, আইনে এ অপরাধেও বোধহয় ফাঁসিরই ব্যবস্থা আছে, কী বল সিপাহীভাই?"

সিপাহী ঘামতে লাগল অত শীতেও। ওই বুড়ীকে এনে সহজেই সাক্ষী দেওয়াতে পারবে এই লোকটা। ওপরের হাকিমের কাছে যেতে হবে না, নীচের সেই বিবেচক হাকিমই ফাঁসি না দিন, চাকরিটা খতম করে দশ বা বিশ ঘা বেত লাগাতে পারবেন ওকে।

মাইলস্ সিপাহীকে রেহাই দিতে রাজী আছে, যদি সে কয়েদী বালককে পথ থেকেই মুক্ত করে দিয়ে যায়।

সিপাহী ভেবে দেখল। এ শহরে জেলখানা নেই। কয়েদখানা বলে একটা বেমেরামত ঘর আছে, তার দরজা ভাঙা। সেখানকার একমাত্র পাহারাওয়ালা এই সিপাহী নিজেই! রাত্রে ভাঙা দরজা আর একটু ভেঙে রেখে কাল সকালে যদি সে রটিয়ে

দেয় যে রাত্রিতে কয়েদখানার ভাঙা দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে কয়েদী ছেলেটা, কে সন্দেহ করবে যে সিপাহী মিছে কথা কইছে ?

একটা নিভৃত জায়গায় গিয়ে সে রাজাকে মুক্তি দিল। তারপর শুয়োরছানাটা কাঁধে নিয়েই বাড়ির দিকে চলল। বুড়ীর মত চোখ ছলছল করছে না বটে, কিন্তু বুকের ভেতরটা করছে ঢিপঢিপ—এ ব্যাপার এখন ভালোয় ভালোয় মিটলে হয়।

৭

কয়েকদিন ক্রমাগত পথ চলছে দুজনে। পায়ে হেঁটে নয়, গাধায় চড়ে। রাজাকে ফিরে পাওয়ার পরেই দুটো গাধা কিনে ফেলেছে মাইলস্। রাজার পরনে আর টম ক্যান্টির সেই ছেঁড়া জামা নেই, তার বদলে অঙ্গে উঠেছে মাইলসের কেনা সেই পুরোনো পোশাক! রাজা হারিয়ে যাওয়ার পরেও সে এ-যাবৎ বয়ে বেড়িয়েছে তার কাপড়গুলি। ফলে শীতে আর তেমন কষ্ট পেতে হচ্ছে না রাজাকে। মনটাও একটু প্রফুল্ল; কারণ মাইলসের দেশে পৌঁছোতে পারলে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী তৈরি করার একটা পথ পাওয়া যেতে পারে হয়ত।

আর মাইলস্? তার আনন্দের আর সীমা নেই। সাত বৎসর পরে সে দেশে ফিরছে। স্নেহময় পিতা আছেন গৃহে, হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পেলে তিনি কত-না আদরে গ্রহণ করবেন তাকে! বড় ভাই আর্থার আছে, মাইলসের চেয়ে সামান্যই বড়, অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী সে। আর আছে কুমারী এডিথ, মাইলসের সাথে যার বিবাহ হবে বলে একরকম স্থির হয়েছিল সেই সাত বৎসর আগে। মাইলস্ জানে সে বিবাহে পুরোপুরি সম্মতিই ছিল এডিথের। আজ আবার দেখতে পাওয়া যাবে তাকে– কী আনন্দ! কী আনন্দ!

সম্ভব হলে মাইলস্ উড়ে যেত এই রাস্তাটুকু। রাজাকে সে কত রকমে শোনাচ্ছে পিতৃগৃহের ঐশ্বর্যের কথা! সত্তরখানা ঘর বাড়িটাতে। সাতাশটা চাকর। বিচিত্র সব খাবার! দেশ বিদেশের নামকরা সব সুরা! কত বড় ফুলবাগান! শিকারের

পশুতে ভরতি বনাঞ্চলই বা কত বিস্তীর্ণ! এক কথায়—ও যেন একটুকরো স্বর্গ। শাপভ্রষ্ট দেবদূত এতদিন পরে আবার সেই স্বর্গে প্রবেশ করছে—কী আনন্দ তার অন্তরে!

গ্রামে প্রবেশ করল মাইলস্ বিকাল নাগাদ। আগের শহরে গাধা দুটো বেচে দিয়েছে। পথ চলার পক্ষে যত সাহায্যই করে থাকুক ওই গাধারা, জমিদারবাড়িতে তাদের নিয়ে প্রবেশ করতে লজ্জা করছে জমিদারপুত্রের। আরে ছিঃ, লোকে ভাববে কী? গাধা বেচে এই তিনটে মাইল সে রাজাকে নিয়ে হেঁটেই এসেছে।

গ্রাম যেমনকার তেমনি আছে। ওই যে সেই রাস্তার ধারে জলের পাম্প, সেই গির্জা, ওই যে পাঠশালা! রুটির দোকান, মাংসের দোকান—কিছুই জায়গা বদল করে নি বা ভোল পালটায় নি। সবই আগের মত রয়েছে, কেবল মানুষগুলো ছাড়া। মানুষ পালটেছে বই কি! কাউকে একেবারেই নতুন লোক বলে মনে হয়, কাউকে আবার অনেক কষ্টে চিনতে পারা গেলেও, তার পরিবর্তনের বহর দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের প্রান্তে এসে পড়ল দুজনে। সেখান থেকে একটা মেটে রাস্তা এঁকেবেঁকে ঢুকে গিয়েছে বাঁ-দিক পানে। সেই রাস্তায় প্রায় আধ মাইল। তার পরেই হঠাৎ একটা বড় বাগান পাওয়া গেল। মাইলস্ ছুটে গিয়ে সেই বাগানে প্রবেশ করল। বাগানের ভেতর বিরাট এক প্রাসাদ। এইটিই সার রিচার্ড হেণ্ডনের বাড়ি।

একটু ঘুরে গিয়ে বড় একটা ঘর পেল মাইলস্ তার দরজা খোলা। তারই ভেতর রাজাকে এক পাশে বসিয়ে রেখে সে ভেতর পানে অন্য ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় এক কোণ থেকে একটা লোক মাথা তুলে তাকাল। তার ওপরে চোখ পড়তেই মাইলস্ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল—"হিউ!"

হিউ কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিল একা বসে বসে।

মাইলস্‌কে দেখে সে বিস্মিত হয়েছিল, এখন তার কণ্ঠ শুনে মুখের রঙ তার ছাইয়ের মত হয়ে এল। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল মাইলসের মুখের পানে। তার ভাবভঙ্গী দেখে মাইলস্ উঠল উচ্চ হাস্য করে, তারপর তার কাছে ছুটে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠল—"কী ভাই হিউ, চিনতে পারছিস না নাকি ?"

হিউ তাকিয়ে আছে মাইলসের দিকে; তাকিয়ে আছে আর ধীরে ধীরে কাঁধটা ছাড়িয়ে নিচ্ছে মাইলসের থাবা থেকে। ছাড়িয়ে নেওয়ার পর সে দুই পা পিছিয়ে দাঁড়াল, তারপর মুখ কালো করে বিরসকণ্ঠে বলল—"আপনি কে মহাশয় ?"

"সে কি রে? তুই চিনতে পারছিস না সত্যিই? আশ্চর্য তো! আমি কি এত বদলে গিয়েছি? আমি মাইলস্ রে, মাইলস্। তোর ভাই মাইলস্ হেণ্ডন!"

একটা যেন চাপা উত্তেজনার সুর বেরুলো হিউয়ের গলা থেকে—"মাইলস্? এও কি সম্ভব? মাইলস্ ফিরে আসবে? যমালয় থেকে ফিরে আসবে মরা মানুষ?"

"মরা মানুষ"—এবার বিস্ময়ের পালা মাইলসের,—"আমি তো শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিলাম, মরলাম কবে?"

"আমরা এখানে বসে—অর্থাৎ চিঠিপত্রে যে খবর এসেছে, তাই ছাড়া আর তো কিছু জানি না! চিঠি এসেছিল যে মাইলস্—আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় মাইলস্, যুদ্ধে মারা গিয়েছে।"

"কিন্তু আজ তো চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছিস যে আমি মরি নি! সে চিঠি মিথ্যা!" একটু বিরক্তভাবেই জবাব দেয় মাইলস্।

"চাক্ষুষ যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখি, আসুন তো, একটু ভাল করে দেখতে দিন—দেখি আপনি সত্যিই মাইলস্ কিনা।"

মাইলস্ অট্টহাসি হেসে উঠল—"ছাখ্, ছাখ্, যত খুশী ছাখ্!

যেভাবে খুশী ছাখ্!" বলে মাইলস্ পা ফাঁক করে হাসিমুখে দাঁড়াল হিউয়ের সমুখে, আর হিউ একবার ডাইনে থেকে, একবার বাঁয়ে থেকে, একবার সমুখে একবার পেছনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে।

বেচারা মাইলস্! সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে যে এইবার ভাই হিউয়েব সব সন্দেহের নিরসন হবে, এইবার সে মাইলস্‌কে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে থাকবে। কোথায় কী? মাইলস্ অবাক্ হয়ে দেখল হিউ ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়েছে, আর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে বিষন্নভাবে।

সে গভীর বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—"হল কী?"

"হল না!"—সখেদে হিউ বলল—"বড় আশা করেছিলাম ভাইকে ফিরে পাব বলে, সে আশা সফল হল না। শুনুন মহাশয়! আপনি বলছেন আপনি সেই মাইলস্ হেণ্ডন—যার মৃত্যুসংবাদ আমরা ছয় বৎসর আগে পেয়েছি। কিন্তু মাইলস্ হেণ্ডনের চেহাবাব সঙ্গে আপনার চেহারার কোন মিল আমি শত চেষ্টাতেও আবিষ্কার করতে পারলাম না।"

মাইলস্ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রোষে ক্ষোভে—"তুমি না পার, পিতা অবশ্যই পারবেন। পিতাকে ডাকো।"

"মরা মানুষকে কেমন করে ডাকব?"—বিদ্রূপের স্বরে জবাব দেয় হিউ।

"মরা? মৃত? পিতা? কী সর্বনাশ!"—মাইলস্ ভেঙে পড়ে যেন।

"প্রিয় পুত্র মাইলসের মৃত্যুসংবাদ তাঁর হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। ওই দুঃসংবাদটা আসার অল্পদিন পরেই পিতা স্বর্গধামে প্রয়াণ করেন। শুধু তিনি নন, আমার বড় ভাই আর্থারও।"

"আর্থারও নেই? আমার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে, কিন্তু এডিথ? এডিথ আছে তো!"

"হ্যাঁ, লেডি এডিথ আছেন।"

"তবে আমার এখনও আশা আছে। তুমি এডিথকে ডাকো, সে নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারবে।"

"বেশ, আমি ডেকে আনছি তাঁকে!"—এই বলে হিউ ভেতরে চলে গেল।

সঙ্গে যে রাজা আছেন, মাইলস্ ভুলেই গিয়েছে সে কথা। হঠাৎ রাজার কথা শুনে তাই সে চমকে উঠল। রাজা বলছেন—"তোমার দুঃখে তুমি এই মনে করে সান্ত্বনা লাভ করতে পার যে আরও অনেক লোক আছে পৃথিবীতে তোমার মতই যারা নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকৃতি আদায় করতে পারছে না। তারা যে তারাই, এই কথাটাই কেউ মেনে নিতে চাইছে না।"

নিজের সম্বন্ধে রাজার এই পরোক্ষ ইঙ্গিত মাইলস্‌কে লজ্জা দিল। কারণ মনে মনে সেও তো রাজাকে রাজা বলে মেনে নেয় নি। কিন্তু সে দিকে কথা না তুলে সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করল—"আমার পরিচয় তা হলে আপনিও কি বিশ্বাস করেন নি?"

রাজা বললেন—"আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু তুমিও কি বিশ্বাস করেছ আমাকে?"

মাইলস্ খুব ফাঁপরে পড়ল। কী উত্তর দেবে, ভাবছে, এমন সময় দরজা খুলে হিউ এসে ঢুকল ঘরে, তার সঙ্গে এক অতি রূপবতী মহিলা। তাঁকে দেখেই মাইলস্ লাফিয়ে এগিয়ে গেল—"এডিথ তুমি তো অন্ততঃ চিনতে পারছ মাইলস্ হেণ্ডনকে?"

এডিথের মুখ মরার মত সাদা। যে চোখে তিনি চাইছেন মাইলসের দিকে, সে চোখ মৃতের চক্ষুর মত দৃষ্টিহীন। তিনি কথা কইছেন—যেন ঘুমের ঘোরে নিশিতে পাওয়া মানুষের মত টেনে টেনে "আমি আপনাকে চিনি না।"

যেমন এই কথা শোনা—মর্মাহত মাইলস্ চিৎকার করে উঠল "এডিথ!" বলে, আর ছুটে এগিয়ে গেল এডিথের দিকে। কিন্তু

এডিথের কাছে সে পৌঁছাতে পারল না, হিউ এসে সম্মুখে দাঁড়াল, আর চোখ লাল করে বলল—"আমার স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করে কথা কইবেন।"

"তোমার স্ত্রী ?"—মাইলস্ যেন বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ হয়ে গেল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত মাত্র! তারপরই বাঘের মত এক লাফ দিয়ে সে গিয়ে পড়ল হিউয়ের ওপর, আর দেওয়ালের গায়ে তাকে চেপে ধরে এত জোরে টুঁটি টিপে ধরল যে সে পাপিষ্ঠের দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হল।

"এরই জন্যে আমাকে চিনতে পারছ না, নয় ? এডিথের স্বামী, হেণ্ডন হলের ভুস্বামী, নাইট উপাধির অধিকারী, সার হিউ কেমন ?"

হিউ যখন এডিথকে ডাকতে গিয়েছিল, সেই সময় পুলিসেও এই বলে একটা খবর পাঠিয়ে এসেছিল যে হেণ্ডন হলে একটা জুয়াচোর এসেছে, তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

মাইলস্ যখন হিউয়ের গলা টিপে ধরে দম বার করে দিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ে এসে পড়ল পুলিসের লোক। তারা দলে পুরু, মাইলস্ প্রাণপণে লড়েও আত্মরক্ষা করতে পারল না। সে তো বন্দী হলই, তার সঙ্গে বন্দী হলেন রাজাও, কারণ জুয়াচোরের সঙ্গী যে জুয়াচোরই হবে, এতে পুলিসের সন্দেহ নেই।

কয়েদখানায় বন্দী। ইংলণ্ডের রাজা চোর, ডাকাত, গুণ্ডার সঙ্গে এক ঘরে এক শিকলে বাঁধা। সারা দিনরাত সে শিকল বাঁধাই থাকে, নিতান্ত প্রয়োজনে অনেক আবেদন নিবেদনে তুই চার মিনিটের জন্যে এক একবার খুলে দেওয়া হয় মাত্র।

ভাল লোকও যে তুই চারজন না আছে, তেমন নয়। তুটি নারী আছে—মা ও মেয়ে। এরা দেশের বর্তমান ধর্ম-ব্যবস্থায় সায় দিতে পারে নি, পোপের বদলে রাজাকে ধর্মীয় ব্যাপারের কর্তা বলে মেনে নিতে পারে নি। এই অপরাধে দীর্ঘ দিন এরা বন্দিনী হয়ে আছে।

রাজাকে ছেলেমানুষ দেখে তাঁর ওপরে এদের মায়া পড়ে গেল। মায়ের মত, দিদির মত এরা দুজনে রাজাকে আদর করে, সান্ত্বনা দেয়, নানা গল্প শুনিয়ে কারাযন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। রাজার ব্যথিত চিত্তে সে সান্ত্বনার প্রলেপ বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর লাগে, তিনি খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েন ওদের। কথায় কথায় জেনে নেন ওদের অপরাধ কী। অপরাধ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে খানিকটা মতদ্বৈধ। এই কথা শুনে রাজা তো হেসেই আকুল। এও আবার একটা অপরাধ নাকি? তিনি ওদের আশ্বাস দেন—"তোমরা অবিলম্বে খালাস হয়ে যাবে। ধর্মীয় ব্যাপার মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সবাই এক রকম ধারায় চিন্তা করবে এটা আশা করাই অন্যায়। বিজ্ঞ বিচারকেরা তোমাদের মুক্তি দিতে বাধ্য।"

বালকের মনে ব্যথা দিতে চায় না মমতাময়ীরা! তারা জানে, দেশের বর্তমান অবস্থায় এ অপরাধ কী সাংঘাতিক অপরাধ! তারা জানে যে অতি ভয়ানক মৃত্যু তাদের গ্রাস করবার জন্যে বদন ব্যাদান করে এগিয়ে আসছে। তারা এসব কথা নিশ্চিতভাবেই জানে, কিন্তু বলে না। ও আলোচনা রাজা যখনই তোলেন, তখনই ওরা চুপ করে যায়।

অবশেষে ওদের বিচার হল। প্রহরীরা ওদের আদালতে নিয়ে গেল, আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল আদালত থেকে। ওদের ফিরতে দেখে রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন—"সে কি? তোমরা মুক্তি পাও নি?"

ওরা শুধু বলে—"আজ বিচার শেষ হয় নি।"

"ও, তাই বল! বিচারে বড় দেরি হয় দেখছি। এটা সংশোধন করতে হবে। এই দেখ না—আমাদেরও ব্যাপারটা ঝুলছে কী রকম ভাবে। অথচ ২০শে ডিসেম্বর আমায় লণ্ডনে পৌঁছুতেই হবে।"

২০শে ডিসেম্বর কেন পৌঁছুতেই হবে লণ্ডনে—সে কথা রমণীরা

জিজ্ঞাসা করে না আর। মাইলস্ তাদের আগেই বলে রেখেছেন যে ছেলেটার মাথায় গোলমাল আছে একটু। লণ্ডনে যাওয়ার প্রয়োজনটাও ওরা সেই পাগলামির একটা অঙ্গ বলে ধরে নিল।

এদিকে মাইলস্ হেণ্ডনেরও বিচার হয়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে রাজারও। হিউ হেণ্ডন এখন এ অঞ্চলের জমিদার, সে যেভাবে মামলা সাজিয়েছে, তাতে বিচারকেরা মাইলস্‌কে সত্যিই একটা বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী প্রতারক বলে ধরে নিলেন—দণ্ডও দিলেন চরম। দুই ঘণ্টা তাকে প্রকাশ্য বাজারের ভেতর তুড়ুং ঠুকে রাখা হবে। রাজারও ওই দণ্ডই হতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিতান্ত বালক দেখে বিচারকেরা তাঁকে সাবধান করে দিয়ে এবারকার মত মুক্তি দিলেন!

এখন, এই তুড়ুং ঠোকা ব্যাপারটার একটা বিশদ বিবরণ দেওয়া দরকার। একটা কাঠের বাক্সের ভেতরে কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে অপরাধীকে প্রকাশ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পা বাক্সের মধ্যে, বাক্স তালা বন্ধ, কাজেই বন্দীর এক পা নড়াবার সামর্থ্য নেই। সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনতা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়, বিদ্রূপ করে, টিটকারি দেয়, ছেড়া জুতো এবং পচা ডিম গায়ে ছুঁড়ে মারে। এমন অত্যাচার হয়, দেহের চাইতে মন তাতে এমন ভেঙে যায় যে তুড়ুং ঠোকার পর কোন লোকই আর বেশীদিন বাঁচে না।

সেদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে রাজার। ঘুম ভাঙার পর লক্ষ্য করলেন, এপাশে মাইলস্ নেই, ওপাশে নেই সেই নারী দুটি। কোথায় নিয়ে গেল ওদের, এই চিন্তায় রাজা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এমন সময়ে কারাধ্যক্ষ এসে সব বন্দীর শিকল খুলে দিয়ে বাইরের দিকে নিয়ে চলল। কারার বাইরেই মাঠ, তারও ওপিঠে রাজপথ।

রাজার প্রথম দৃষ্টি পড়ল হেণ্ডনের দিকে। ওকে তুড়ুং ঠুকে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। চারদিকে বিপুল জনতা। পচা ডিম, ছেঁড়া জুতো এবং ততোধিক যন্ত্রণাদায়ক সদুপদেশ তারা অকাতরে

বিতরণ করে যাচ্ছে। মাইলস্ মাথা নীচু করে নীরবে সহ্য করছে এসব।

তার দিকেই ছুটে যাচ্ছিলেন রাজা, এমন সময়ে ওর চেয়েও বীভৎস, ওর চেয়েও মর্মান্তিক আর একটি দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। সেই মেয়ে দুটি। লোহার খুঁটি পুঁতে তাতেই বাঁধা হয়েছে তাদের। তারপর তাদের কোমর পর্যন্ত উঁচু করে সাজানো হয়েছে শুকনো কাঠ। একজন সরকারী কর্মচারী হেঁট হয়ে সেই কাঠে জ্বালাচ্ছে আগুন।

ওদের জীবন্ত দগ্ধ করবার আদেশ দিয়েছেন ধর্মাধিকরণ। রাজার কাছে ওরা গোপন করেছিল সেকথা।

আগুন জ্বলে উঠল। প্রথম শিখার স্পর্শেই নারী দুটির সে কী ভীষণ আর্তনাদ! রাজা এতক্ষণ ভূতগ্রস্তের মত তাকিয়ে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন। দেখছেন সব। বুঝতে পারছেন সব, কেবল নিজের পক্ষ থেকে হাতেকলমে কোন কিছু করবার তাঁর শক্তি নেই। একটা জাদু যেন এসে তাঁর দেহ এবং মন দুটোকেই পক্ষাঘাতে অবশ করে ফেলেছে।

কিন্তু ওই চিৎকার! শানিত তরবারির মত সেই ভয়ার্ত চিৎকার রাজার নিস্তব্ধতাকে কেটে যেন খান খান করে দিল। তিনি লাফিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন, চেঁচিয়ে বললেন—"এ পৈশাচিক দণ্ডাদেশ বাতিল হল। আমি ষষ্ঠ এডোয়ার্ড, ইংলণ্ডের রাজা—স্বয়ং আদেশ দিচ্ছি, এই বন্দীদের সসম্মানে মুক্তি দাও। আর সবাই শোন—ধর্মের নাম নিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মারার প্রথা আজ থেকে বিলুপ্ত হল। রাজার এই আদেশ।"

একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি। রাজার সুমহৎ ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দেয় নিষ্ঠুর প্রজাদের পৈশাচিক বিদ্রূপ। কয়েকজন প্রহরী এসে চেপে ধরল রাজাকে। সরকারী কাজে বাধা দিতে আসা রাজদ্রোহেরই সামিল।

বিচারকও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই রাজদ্রোহের জন্য দণ্ডদান করবেন। না দিলে তাঁকে ছাড়বে কেন জনতা? তারা মজা দেখতে এসেছে। মজার সংখ্যা যত বাড়বে, বৈচিত্র্য যত বাড়বে, ততই আনন্দ বেশী হবে কৌতূহলী জনতার।

কাজেই বিচারক আদেশ দিলেন—"এই রাজদ্রোহী বালককে পিঠ আলগা করে বারো ঘা বেত মারা হোক।"

সঙ্গে সঙ্গে জামা খুলে নেওয়া হল রাজার। একজন জল্লাদ এসে চাবুক হাতে করে দাঁড়াল। রাজার পিঠে বেত? ধরণী, দ্বিধা হও।

তুড়ুং থেকে মাইলস্ চেঁচিয়ে উঠল—"শোনো, শোনো, ও ছেলেটি পাগল। পাগলের অপরাধ অপরাধই নয়। আর যদি তা অপরাধ বলেই গণ্য হয়, মহামান্য বিচারকের আদেশ যদি অলঙ্ঘ্যই হয়, তবে ওই চাবুকের ঘা আমার পিঠে পড়ুক। আমায় তুড়ুং থেকে খুলে নিয়ে চাবুক মারো, তারপর আবার তুড়ুঙে আটকে দিও।"

হ্যাঁ, আইনে এরকম বিধানও আছে যে একজনের দণ্ড আর একজন নিতে পারে ইচ্ছা করলে। বিচারকের আপত্তি করার কিছু নেই। আইনের মর্যাদা রক্ষা পেলেই হল।

* * *

দুটি রমণী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মাইলস্ হেণ্ডনের পিঠ দিয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। নীরবে বারো ঘা চাবুক সে পিঠ পেতে নিয়েছে। সে আবার তুড়ুঙে আবদ্ধ হয়েছে।

রাজা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে, অতি ধীরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন "তোমাকে পুরস্কার যা দেবার, ভগবানই দিয়েছেন। দিয়েছেন এক অতি মহৎ হৃদয়। তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান কোন রাজাই দিতে পারে না। রাজা দিতে পারে শুধু কৃতজ্ঞতা। সেই কৃতজ্ঞতাকেই রূপ দেবার জন্য আমি তোমাকে আর্ল উপাধিতে ভূষিত করছি। আজ থেকে তুমি আর্ল অব্ কেণ্ট।"

৮

কিন্তু ওদিকে টম ক্যান্টির অবস্থাটা কী ?

আঁস্তাকুড় বস্তির ভিখারী বালক দৈববশে আশ্রয়লাভ করেছে রাজপ্রাসাদে। শুধু আশ্রয়লাভই নয়, প্রাসাদ তাকে গ্রহণ করেছে সর্বময় প্রভু বলে। আর্ল-ডিউকেরা তার হস্তচুম্বন করছে, রাজকুমারীরা এসে হাঁটু গেড়ে বসেছে তার সম্মুখে। চারশো'র ওপর চাকর আছে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাবার জন্য। সারা পৃথিবী বিলাসসামগ্রী উপহার পাঠাচ্ছে, যাতে তার আহারে বিহারে রাজকীয় সমারোহের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়। সুখেই আছে টম ক্যাণ্টি, পরম সুখে।

প্রথম প্রথম অস্বস্তি লাগত। যে রাজপুত্র দয়াপরবশ হয়ে তাকে প্রাসাদে এনে ঢুকিয়েছিলেন, ঢুকিয়ে দিয়েই নিজে যেন জাদুমন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তাঁর ভাগ্যের কথা ভেবে অশান্ত হয়ে উঠত মনটা। তিনি গেলেন কোথায় ? কেন গেলেন ? তিনি কষ্ট পাচ্ছেন না তো ?

কিন্তু তার পরেই এল ভাবান্তর। মনে জাগল আশঙ্কা—যিনি চলে গিয়েছেন, তিনি আবার আসবেন না কি ? এলেই তো টম ক্যাণ্টিকে আবার ফিরে যেতে হবে তার বস্তির জীবনে। একটা পেনি ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে পথে পথে, আর ভিক্ষা না পেলে বাড়ি ফিরেই মার খেতে হবে জন ক্যাণ্টির হাতে। কী বিভীষিকা!

রাজার প্রত্যাগমনের মতই মা-বোনের সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনাও এখন তার কাছে ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথে-ঘাটে বেরুতে হয় জমকালো মিছিলের পুরোভাগে স্বর্ণখচিত শকটে বসে। লক্ষ লোকে তখন তাকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে দেখে, রাজভক্তি

নিবেদন করে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে। ওই লক্ষ লোকের ভেতরে তার মা-বোনও কি কোন কোন দিন থাকে না? তারা যদি হঠাৎ একদিন এই রাজবেশী টমকে নিজেদেরই টম বলে চিনে ফেলে? তক্ষুনি কি তারা "টম, আমাদের টম" বলে ছুটে আসবে না তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে? যদি সেরকম ঘটে, যদি তারা ছুটেই আসে, কী করবে টম তখন? "চিনি না এদের" বলে হাঁকিয়ে দেবে? আর রাজার দেহরক্ষীরা টমের সামনেই লাথি মারতে মারতে দূর করে দেবে তাদের? তা ছাড়া উপায় থাকবে না ও রকম অবস্থা ঘটলে। কিন্তু সে পরিস্থিতি কি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হবে না টমের পক্ষে? তারই মা, তারই বোন বেটি আর ন্যান্—যারা সেদিন পর্যন্ত নিজেদের ভাগের পোড়া রুটিখানা নিজেরা না খেয়ে রেখে দিয়েছে টমকে খাওয়াবে বলে? ওঃ ভগবান! ওদের সঙ্গে আর যেন দেখা না হয়। পূর্ব জীবনের কারও সঙ্গেই যেন দেখা না হয় আর।

হঠাৎ কিন্তু পূর্ব জীবনের একজনের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। অন্তরঙ্গ কেউ নয়, দৈববশতঃই একদিন একটা বিশেষ মুহূর্তে টম একে দেখেছিল একটিবার। সেদিনটা ছিল বৎসরের প্রথম দিন। ওরা টেমস্ নদীতে সাঁতার কাটছিল। হঠাৎ গাইল্‌স উইট গভীর জলে গিয়ে পড়ল—স্রোতের টানে সে ভেসে যেতে লাগল। টমেরা কেউ সাহস পেল না তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে। ওই মাঝনদীর খরস্রোতে কে যাবে ডুবে মরতে!

তাদের চিৎকারে একজন অচেনা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে. আর ক্ষিপ্রবেগে সাঁতার কেটে গিয়ে গাইল্‌সকে উদ্ধার করে আনল সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে। ওকে তীরে তুলে দিয়েই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ আর পেল না কেউ।

সেই লোক! হঠাৎ রাজা টমের সম্মুখে এসে পড়ল এক অদ্ভুত অবস্থায়। টম দরবার মিলিয়ে বসেছে প্রাসাদচত্বরে। রাজপথ

দিয়ে চলে যায় বহু লোক কোলাহল করতে করতে। এমন উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে তারা যে চত্বরে রাজাকে উপস্থিত দেখেও কেউ একবার তার জয়ধ্বনি করছে না!

টম পার্শ্ববর্তী লর্ড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করল—"কী হয়েছে ওদের?"

লর্ড বিনীতভাবে অভিবাদন করে বলল—"প্রভু ও একটা আসামী! মৃত্যুদণ্ডে ও দণ্ডিত হবে। ওকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

"কিসের জন্য মৃত্যুদণ্ড? কী করেছে ও?"

"মহারাজের আদেশ পেলে আমি গিয়ে জেনে আসি।"

"গিয়ে ওকে নিয়ে আসুন। আমি দেখব লোকটাকে।"

একান্তই বালকোচিত কৌতূহল। কিন্তু বালক রাজা মাঝে মাঝে বালকোচিত ব্যবহার করবে—এটা কারো কাছ অস্বাভাবিক মনে হল না। লর্ড মহাশয় তখনই ছুটে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই রক্ষীবেষ্টিত অপরাধীকে নিয়ে ফিরে এলেন। সঙ্গে আদালতের কর্মচারীও আছেন, কারণ মৃত্যুদণ্ডের পূর্বক্ষণে অপরাধ এবং দণ্ডের বিশদ বিবরণ দর্শকদের জানানোর একটা রীতি রয়েছে। সে কাজ আদালতের লোকই করবে।

সবাই এসে নতজানু হয়ে রাজাকে অভিবাদন করল।

টম তাকিয়ে দেখল অপরাধীকে। হঠাৎ তার মনে হল লোকটাকে সে আগে দেখেছে। কিন্তু কোথায়? কবে? কিছুতেই সে কথা মনে করতে পারল না। অগত্যা সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কী এর অপরাধ?"

"অপরাধ নরহত্যা। বিষ খাইয়ে একটা লোককে এ হত্যা করেছিল।" উত্তর দিল আদালতের কর্মচারী, "একদিন সকাল বেলায় এ এক চাষীর বাড়িতে গিয়েছিল কাজের খোঁজে। লণ্ডন থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে এক গ্রামে। কাজ পায় না, চাষীর সঙ্গে

সামান্য কারণে ওর বচসাও হয়। তারপর ও বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে, এবং চাষী হঠাৎ পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা যায়।"

টম বলল—"কিন্তু এ কী করে বিষ দিল, তার কী প্রমাণ আছে?"

"এ যখন চাষীর বাড়িতে গেল, তখন চাষী কফি খাচ্ছিল। পরে সেই কফির পেয়ালাতে বিষ পাওয়া গিয়েছে, পাওয়া গিয়েছে চাষীর পেটের মধ্যেও।"

"কিন্তু বিষটা তো অন্য লোকেও দিয়ে থাকতে পারে?" জিজ্ঞাসা করে টম।

"মহারাজ! খুব ভাল রকম তদন্ত করে জানা গিয়েছে যে ওইদিন সকালে চাষীর বাড়িতে অন্য কোন লোক ছিল না, বা আসে নি।"

টম মাথা নাড়ল--"নিয়ে যাও একে আমার যা জানবার ছিল, জেনেছি।"

হঠাৎ অপরাধী কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"মহারাজ! মহারাজ! এ অভাগার একটা আরজি শুনুন দয়া করে। আমি নিরপরাধ। ভগবান জানেন, এ হত্যা আমি করি নি। কিন্তু সে কথা বলে আর লাভ নেই। বিচারক যখন মৃত্যুদণ্ডে আমায় দণ্ডিত করেছেন, তখন মৃত্যু আমার হবেই। তবে আমার শুধু এইটুকু প্রার্থনা যে ফুটন্ত তেলে সিদ্ধ করে আমায় যেন মারা না হয়, তার বদলে আমার ফাঁসি দেওয়া হয় যেন।"

"ফুটন্ত তেলে সিদ্ধ করে মারা?"—শিউরে ওঠে টম।

তাকে বোঝাবার ভার নিলেন লর্ড হার্টফোর্ড, ডিউক সমারসেট—"আমরা তো তবু জার্মানদের মত অত যন্ত্রণা দিই নে। আমরা মানুষটাকে একেবারে ডুবিয়ে দিই তেলের ভেতরে। জার্মানিতে তাকে ওপর থেকে ঝুলিয়ে একটু একটু করে নামানো হয়। প্রথমে পা ডোবে, পা-টা জ্বলে গেলে তারপর হাঁটু পর্যন্ত ডোবে, তার পর জানু পর্যন্ত—এই রকম আর কি! হ্যাঁ, আমরা এ বিষয়ে অনেকখানি কোমল।"

আসামীটা হার্টফোর্ডের মুখে জার্মানির আসামীদের অবস্থা শুনে

কোথায় নিজেকে ভাগ্যবান বলে ভাববে, তা নয়, সে এমনধারা ককিয়ে উঠল যেন এইমাত্র ওপর থেকে ঝুলিয়ে তার পায়ের পাতা দুখানা ফুটন্ত তেলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ককিয়ে ককিয়েই সে বলল—"মহারাজ! ওইটুকু দয়া করুন আমাকে। ফাঁসিতেই যেন আমি মরতে পারি। শপথ করে বলছি প্রভু, হত্যা আমি করি নি! বরং বলতে পারি, প্রাণ নেওয়ার বদলে ওই দিন ওই সময়ে আমি একজনের প্রাণ রক্ষা করেছিলাম টেমস্ নদীতে।"

"কী রকম?" টমের কী যেন মনে পড়ে পড়ে, পড়ে না।

"সত্যিই বলছি মহারাজ, এই লণ্ডনের টেমস্ নদী থেকে গাইল্স বলে এক ছোকরাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম ওই দিন, ওই সকাল দশটার সময়ে।"

.উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না টম। আদালতের কর্মচারীকে বলে—"লণ্ডনের পঞ্চাশ মাইল দূরের ওই চাষীকে বিষ দেওয়া হয়েছিল কবে? কখন?"

কর্মচারী উত্তর দেয়—"বৎসরের প্রথম দিন, পয়লা জানুআরি, বেলা তখন আন্দাজ দশটা।"

টম চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে দমন করল নিজেকে। সে চিনেছে। পয়লা জানুআরি সকাল বেলায় গাইলস্ উইটকে টেম্সের গ্রাস থেকে যে উদ্ধার করেছিল, সে লোক এই বটে। পয়লা জানুআরি। ঠিক মনে আছে তারিখটা টমের! এ লোক ওই একই দিন সকাল বেলায় পঞ্চাশ মাইল দূরের চাষীকে বিষ দিয়েছিল, এটা একেবারেই অসম্ভব।

তখন সে তার জীবনের প্রথম রাজাদেশ ঘোষণা করল—"এ লোক কখনও এ হত্যা করে নি বলেই আমার বিশ্বাস। একে মুক্তি দাও।"

কেউ বিস্মিত হল না। বন্দী মুক্ত হয়ে তারস্বরে রাজার করুণার জয়গান করতে লাগল। সভাসদেরা ভাবতে লাগল, রাজার উন্মাদ রোগ ধীরে ধীরে সেরে যাচ্ছে। যেভাবে এই বিচারকর্মটি তিনি

সমাধা করলেন, তাতে মস্তিষ্কবিকৃতির কোন লক্ষণ তাঁর ভেতরে তো দেখা যায়ই নি, উলটে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তীক্ষ্ণ রাজবুদ্ধির, যেমনটি থাকা উচিত অষ্টম হেনরির সুযোগ্য বংশধরের মাথায়।

ওই দিনই লর্ড হার্টফোর্ড ঘোষণা করলেন—আগামী ২০শে তারিখ যুবরাজ এডোয়ার্ড আনুষ্ঠানিক ভাবে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর শুভ অভিষেক সম্পন্ন হবে ঐতিহাসিক পুণ্যপীঠ ওয়েস্টমিনস্টার গির্জাতে।

* *

মনে নৈরাশ্য, দেহে যন্ত্রণা। মাইলস্ হেণ্ডন নিজের দেশ-গাঁ ছেড়ে বেত্রাহত কুকুরের মত পালাচ্ছে। সব চেয়ে বেশী ব্যথা এই যে এডিথ তাকে চিনল না। অর্থাৎ চিনেও ভান করল না-চেনার। যে এডিথ একদিন কথা দিয়েছিল যে মাইলস্ ছাড়া আর কারও সে হবে না কোনদিন। ঘটনাচক্রে অসম্ভবও সম্ভব হয়। হিউকে বিবাহ না করে তার উপায় নেই, এমন পরিস্থিতির হয়ত উদ্ভব হয়েছিল। বিবাহটা মাইলস্ ক্ষমা করতে পারত, যদি সে বুঝত যে অন্তরে এডিথ আগের এডিথই আছে।

এডিথ যে আগের এডিথই আছে, একথা কে বুঝিয়ে দেবে মাইলস্‌কে? না-চেনার ভানটা যে নিছক অভিনয়মাত্র, আর সে অভিনয় যে মাইলস্‌কেই রক্ষা করবার জন্য, এমন ধারণা কী করে হবে মাইলসের? এডিথ বুঝেছিল যে, সে যদি মাইলস্‌কে মাইলস্ বলে স্বীকৃতি দেয় তাহলে হিউ মরিয়া হয়ে উঠবে নিজের সর্বনাশ ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। সার রিচার্ড হেণ্ডনের মৃত্যুর পর জমিদারির মালিক ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্থার হেণ্ডন, এবং আর্থারের মৃত্যুর পর সে-মালিকানা লাভ করেছে সার রিচার্ডের দ্বিতীয় পুত্র মাইলস্! লোভের বশবর্তী হয়ে মাইলসের একটা মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটিয়েছিল হিউ। যে চিঠি ইওরোপ থেকে এসেছে বলে সে প্রচার করেছিল, সেটা আসলে তার নিজেরই লেখা জাল চিঠি। বার্তাবহও তারই হাতের লোক।

এমনি করে সে জমিদারি দখল করেছে, এবং সার রিচার্ডকে দিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়ে এডিথকে বাধ্য করেছে তাকেই বিবাহ করতে।

এখন সে এডিথের স্বামী এবং জমিদারির মালিক। কিন্তু মাইলসের আবির্ভাব যে তার জমিদারগিরি ঘুচিয়ে দিতে বসেছিল! এডিথ যদি মাইলস্‌কে মাইলস্‌ বলে মেনে নেয় তাহলে হিউ খুনই করবে মাইলস্‌কে! এই জায়গায় হিউয়ের ক্ষমতা এখন অসীম। খুন করে মৃতদেহ গোপন করে ফেলা তার পক্ষে একটুও শক্ত নয়। হেণ্ডন হলের ভৃত্যেরা সব নতুন লোক, মাইলস্‌কে তারা দেখেই নি কোনদিন। পুলিস হিউয়ের বাধ্য, তার পাপ তারা দেখেও দেখবে না। এই অবস্থাতেই এডিথ বিবেচনা করেছে যে মাইলস্‌কে বাঁচানোর এক-মাত্র উপায় তাকে মাইলস্‌ বলে স্বীকার না করা। তার সে সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল, তা তো দেখাই যাচ্ছে। প্রতারক বলে তাকে তুড়ুং ঠোকা হয়েছে, কিন্তু প্রাণটা তার যায় নি। সে আর কোন রকমে নিজেকে মাইলস্‌ বলে প্রমাণ করতে পারবে না, এইটি বুঝেই হিউ তার প্রাণটা ভিক্ষা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে।

মাইলস্‌ এখন করবে কী? কারাগারে বসেই সে শুনেছে যে নতুন রাজা এডোয়ার্ড বয়সে বালক হলেও খুব বিবেচক এবং দয়ালু। কথাটা রটনা হয়েছে গাইলস উইটের উদ্ধারকর্তা সেই লোকটির মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে দেওয়ার পর থেকে। এখন সেই রটনার কথা শুনে মাইলস্‌ ভাবছে, কোনমতে যদি সেই নতুন রাজার কাছে নিজের ব্যাপারটা উত্থাপন করা যায়, তা হলে হয়ত তিনি সুবিচার করতে পারেন। মুক্তি পেয়েই তাই সে সংকল্প করেছে লণ্ডনে যাবে। সেখানে তার পিতার বন্ধু সার হামফ্রে আছেন রাজপ্রাসাদের কী একটা উচ্চ পদ দখল করে। তিনি হয়ত মাইলসের হয়ে রাজার কাছে দু'কথা বলতেও পারেন। এইমাত্র পথ তার সমুখে খোলা আছে।

তাই সে চলেছে লণ্ডনে।

কিন্তু রাজার মত তো নেওয়া হয় নি! তিনি কি লণ্ডনে যেতে চাইবেন? মাইলস্ জানে, লণ্ডনের স্মৃতি রাজার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। সেখানে তাঁর জীবন যেতে বসেছিল জনতার হাতে। তিনি যদি যেতে না চান, মাইলসের উভয়সংকট হবে। কোন মতেই সে রাজাকে ফেলে যেতে পারবে না। এত সে ভালবেসে ফেলেছে এই পথচর উন্মাদ বালককে যে, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে এ কল্পনাই অসহ্য তার পক্ষে। মহাপ্রাণ মাইলস্ নিজের হাজার বিপদের মাঝখানেও সে উন্মাদ বালকের খেয়াল-খুশিকে ব্যঙ্গ করে নি একবারও। যখন "আজ থেকে তুমি আর্ল অব কেণ্ট" বলে রাজা তাকে সম্মানিত করলেন, তখন সেটা পাগলের পাগলামি বলে স্থির জানলেও, মাইলস্ সেই খেলা-খেলার সম্মানকে প্রত্যাখ্যান বা উপহাস করে নি। এমন ভাব দেখিয়েছে যেন সত্যিকার রাজার কাছ থেকে সত্যিকার আর্ল পদবী লাভ করে সে সত্যিই সম্মানিত।

তাই, অভিনয়ের ধারা বজায় রাখবার জন্য সে রাজার কাছে জিজ্ঞাসা করল—"এখন কোন্‌দিকে আমরা যাব, মহারাজ আজ্ঞা করুন!"

রাজা ঝটিতি আজ্ঞা করলেন, "যাব আমরা লণ্ডনে।"

বাঁচল মাইলস্! রাজা অন্য রকম কিছু বললে সে বিপদেই পড়ত।

রাজার লণ্ডন যাওয়ার সিদ্ধান্তের তো সংগত কারণই রয়েছে। কারাগারে থাকার সময়ই তিনি শুনেছেন যে আগামী ২০শে তারিখ নতুন রাজার অভিষেক হবে ওয়েস্টমিনস্টার গির্জাতে। এই নতুন রাজা যে সেই ভিখারী বালক টম ক্যান্টি ছাড়া কেউ নয়, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি। তিনি মনস্থ করেছেন, ওই ২০শে তারিখেই অভিষেক-মণ্ডপে দাঁড়িয়ে তিনি সর্বসমক্ষে টম ক্যান্টিকে প্রতারক বলে ঘোষণা করবেন। সত্য আর মিথ্যা যদি পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মিথ্যা কখনোই জয়ী হতে পারবে না, এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

আবার গাধা কিনেছে মাইলস্। রাজা আগে আগে, মাইলস্ পেছনে। যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন! নিয়তির কী পরিহাস! দুজনেরই চিন্তা এক জাতীয়! কী উপায়ে অনধিকারীকে হটিয়ে নিজের অধিকার কায়েম করা যায়। এ ব্যাপারে রাজা ভাবছেন না মাইলসের কথা, তাঁর বিবেচনায় ওটা তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তিনি নিজে রাজপদ ফিরে পাবেন যখন, এক কথাতেই তো মাইলস্ হেণ্ডন পৈতৃক জমিদারির দশগুণ বৃহৎ ভূসম্পত্তি পেয়ে যাবে! রাজা কি তাকে আর্ল করে দেন নি?

ওদিকে মাইলস্ও ভাবছে না রাজার কথা। উন্মাদ বালকটার যা কিছু ভবিষ্যৎ, তা তো মাইলসের নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গেই জড়িত! মাইলস্ যদি জমিদারি ফিরে পায়, সে ছেলেটাকে চিকিৎসা করাবে, লেখাপড়া শেখাবে, মানুষ করে তুলবে। যদি নিজে সে দাঁড়াতে না পারে, তা হলে ছেলেটারও তো কোন উপায় সে করতে পারবে না। সব নির্ভর করছে হামফ্রের চেষ্টার ওপর। কাজেই এখন রাজার কথা ভাবার সময় নয়।

প্রায় নীরবেই পথ চলে দু'জনে। উনিশ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় আবার সেই লণ্ডন ব্রিজে পা দিল ওরা। মহোৎসবের ছোঁয়াচ ইতিমধ্যেই লেগেছে নগরের গায়ে। লোকে লোকারণ্য। শহর উপচে জনস্রোত সেতুর ওপরে এসে পড়েছে। কাল রাজার অভিষেক। রাজভক্তির নেশায় উন্মাদ হয়েছে প্রত্যেকে! কারণে অকারণে মুহুর্মুহু চিৎকার করছে—"জয় মহারাজ এডোয়ার্ডের জয়!" আর সুরা! সবাই সুরা পান করাচ্ছে সবাইকে। আর ধেইধেই নৃত্য করছে, বেতালা বেসুরো গানে আকাশ বিদীর্ণ করে ফেলছে।

এই বিশাল উচ্ছৃঙ্খল জনতার মাঝখানে এসে পড়ল মাইলস্, সঙ্গে রাজা। অতি কষ্টে পথ করে দুজনে এগিয়ে চলছে পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে। এমন সময়ে এক দুর্বিপাক!

ব্রিজের প্রত্যেকটা স্তম্ভের মাথায় একটি করে নরমুণ্ড বসানো।

ভূতপূর্ব মহারাজ অষ্টম হেনরির দীর্ঘ রাজত্বকালে একে একে বহু গণ্যমান্য আর্ল-ডিউক-নাইটের শিরশ্ছেদ ঘটেছিল। রাজার খেয়ালে সেই ছিন্ন মুণ্ডগুলি এনে বসানো হয়েছিল লণ্ডন ব্রিজের স্তম্ভের মাথায়। সারি সারি স্তম্ভ, সারি সারি মুণ্ড। তবে সব মুণ্ডের এক অবস্থা নয়। অতি পুরাতনগুলি অস্থিসার, অপেক্ষাকৃত নতুনগুলির মাথায় চুল এবং মুখে মাংস রয়েছে এখনো।

কী জানি কেমন করে এরই একটা মাথা স্তম্ভের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল চলমান জনতার মাঝখানে কোন এক পানোন্মত্ত পথিকের মাথায়। পড়েই সেটা গড়িয়ে নীচে পড়ল, এবং পায়ে পায়ে ধাক্কা খেতে খেতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল দেখতে দেখতে। কেউ দেখল না যে কী পড়েছিল ওপর থেকে।

যার মাথায় ওটা প্রথম পড়েছিল, সে ভাবল পার্শ্ববর্তী অন্য কোন লোক তার মাথায় গাঁট্টা মেরেছে খুব জোরে! সে স্বভাবতঃই পালটা শোধ দিল। যাকে হাতের নাগালে পেলো, তাকেই গাঁট্টা মেরে বসল। সে বেচারা নির্দোষ, সে কেন নীরবে মার হজম করবে? বেধে গেল ঘুষোঘুষি, হাতাহাতি, মারামারি।

জনতার ভেতর এই জাতীয় ব্যাপার ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুদ্বেগে। যে যাকে পারে, মেরে বসে। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। রীতিমত একটা দাঙ্গা বেধে গেল, যার ধাক্কা গিয়ে লাগল দূরবর্তী মাইল্‌স আর রাজার গায়ে। ফলে, আর কিছু নয়, দুজনকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হল।

ওরকম ভিড়ে একবার আলাদা হয়ে পড়লে ফিরে আবার একত্র হওয়া একেবারেই অসম্ভব। রাজা আর সে চেষ্টা করলেন না। ধাক্কা খেতে খেতে কোন রকমে পুলটা পার হয়ে তিনি সোজা ওয়েস্ট-মিনস্টারের দিকে চললেন। পথ চিনতে কষ্ট পেতে হল না। কারণ, হাজার হাজার লোক ওই একই পথে চলেছে। কাল প্রভাতেই অভিষেক। এখন থেকে গিয়ে ধারে কাছে কোথাও স্থান অধিকার

করতে চায় ওরা। ভেতরে তো অভিজাতেরা ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না। তবু নিকটে কোন উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়াতে পারলে মাঝে মাঝে এক একটা দেখবার-মত জিনিস দেখতে পাওয়াও যেতে পারে।

•

ওয়েস্টমিনস্টারের চারদিকে লোকারণ্য। ঘুরপাক খাচ্ছে সবাই গির্জাটা ঘিরে। কোথায় দাঁড়ালে সুবিধা হবে তাই নিয়ে গবেষণা করছে। তাদের সঙ্গে মিশে রাজাও ঘুরতে লাগলেন। পেছনের দিকে একটা ছোট দরজা দিয়ে মিস্ত্রিরা আনাগোনা করছে। দরবার কক্ষ সাজানোর কাজ এখনও চলছে তাদের। চলবে সারা রাত্রি ধরে তাদেরই একটা দলের সঙ্গে মিশে রাজা ভেতরে ঢুকে পড়লেন। মিস্ত্রি-বালকের মতই হীন বেশ তাঁর, কেউ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল না।

গিল্ডহলে একদিন ঢুকতে পারেন নি, সে শিক্ষা ভোলেন নি রাজা। তাই আজ গোপনে গভীর রাত্রে ওয়েস্টমিনস্টারে প্রবেশ করলেন পেছনের দরজা দিয়ে।

সারারাত লণ্ডন শহরের ঘুম নেই।

দরিদ্রেরা যত্রতত্র স্থান করে নিয়েছে ওয়েস্টমিনস্টারের আশে-পাশে। উপাধিহীন ধনীরা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেছেন, তাই দেখিয়ে দুপুর রাত্রেই গির্জায় ঢুকে পড়লেন গ্যালারিতে আসন গ্রহণ করবার জন্য। দেরি হলে হয়ত জায়গা পাওয়া যাবে না। জায়গার অনুপাতে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেশী।

রাত তিনটাতে কামান গর্জে উঠল টাওয়ারে। আজ রাজার অভিষেক। এ কামান গর্জন তারই ঘোষণা। সকাল সাতটায় প্রথম লর্ডপত্নীরা প্রবেশ করলেন। লর্ড ও লর্ডপত্নীদের আসন নির্দিষ্ট হয়েছে হলের ভেতর। এক একজন লর্ডপত্নী আসছেন, আর সিল্ক ভেলভেটে সজ্জিত রাজকর্মচারীরা তাঁদের আসন খুঁজে বার করে তাঁদের আরামে বসবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। প্রত্যেকের আসনের সমুখে একখানি টুল। এর ওপর স্থাপিত হল লর্ড পত্নীদের করোনেট বা মুকুট। রাজার যেমন রাজমুকুট আছে, লর্ড ও লর্ডপত্নীদেরও তেমনি আছে ছোট মুকুট। রাজমুকুটের মত অত জমকালো বা বৃহৎ না হলেও—এসব খুদে মুকুটও হীরে-মুক্তায় মোড়া।

লর্ডপত্নীরা সবাই এসে গেলেন বেলা নয়টার ভেতরে। ততক্ষণে দুই এক ফালি রৌদ্রও ঢুকেছে গির্জার ভেতরে। গির্জার হলকে দেখাচ্ছে যেন রৌদ্র-ঝলমল ফুলবাগানের মত। এক একটি মহিলা এক একটি প্রস্ফুটিত কুসুম। বস্ত্রালংকারের যেমন মন-

মজানো চমক, অসংখ্য করোনেটের তেমনি চোখ ধাঁধানো ঝলক। ক্ষণে ক্ষণে নানা রঙের বিত্যুৎ খেলে যাচ্ছে যেন গির্জার ভেতরে।

তারপর আসতে শুরু করলেন লর্ডরা। পাঁচশো বছর ধরে ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাতায় পাতায় যেসব আর্ল-ডিউক বংশের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে, তাদেরই বংশধরেরা পাশাপাশি সবাই উপস্থিত। একটা দেখবার মত দৃশ্য। গ্যালারির মানুষেরা ছ'চোখ মেলে দেখছে। জীবনে এ সুযোগ আর হয়ত আসবে না। রাজার অভিষেক তো ঘন ঘন হয় না!

ঠিক তুপুরে ধর্মমহামণ্ডলের প্রভুরা—আর্কবিশপ ও যাজক প্রধানেরা এসে বেদীর ওপর স্থান গ্রহণ করলেন। বেদীখানি অতি প্রশস্ত, তার মধ্যস্থলে চারধাপ সিঁড়ির মাথায় স্থাপিত রাজ-সিংহাসন। সিংহাসনের একপাশে দাঁড়ালেন ধর্মনেতারা, অন্যপাশে দাঁড়াবেন, রাজা ও রাজ-অমাত্যেরা। তাঁরা এখনও আসেন নি।

আবার একটা কামান গর্জালো। এইবারে প্রাসাদ থেকে রাজা এসে পৌছলেন। বাইরে জনতার কী উল্লাস!

এখনও কিছু সময় লাগবে রাজার বেশ-পরিবর্তনের জন্য।

বিদেশী রাজদূতেরা আসছেন। এক একজনের অঙ্গ যেন হীরে মুক্তায় মোড়া, যেদিকে ফিরছেন, আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে অঙ্গ থেকে। গ্যালারির দর্শকেরা মিনিটে মিনিটে নতুন নতুন রোমাঞ্চে পুলকিত হয়ে উঠছেন। একঘেয়ে লাগবে তার জো কী!

অবশেষে ঘণ্টা বেজে উঠল একটা। ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে টম ক্যান্টি প্রবেশ করল রাজপরিচ্ছদে অঙ্গ ভূষিত করে। সোনালী সাটিনে তৈরী সে পরিচ্ছদের আষ্টেপৃষ্ঠে হীরে বসানো।

টম ক্যান্টির পশ্চাতে রাজমাতুল লর্ড হার্টফোর্ড, ইদানীং তাঁর উচ্চতর উপাধি হয়েছে ডিউক অব্ সমারসেট, এবং তিনি নিযুক্ত হয়েছেন রাজ অভিভাবক, রাজার সর্বপ্রধান কর্মচারী।

তা ছাড়া আছেন লর্ড সেণ্টজন, চ্যান্সেলর, মার্শাল ইত্যাদি রাজপুরুষ, রাজার নিয়মিত পার্শ্বচরদ্বয় যাঁরা, তাঁরা সবাই।

এইবারে গাওয়া হল একটি ভগবৎ স্তোত্র। তারপরই শুরু যাবতীয় চিরাচরিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল এইসব ব্যাপারে, সব কিছু ব্যাপারেরই কেন্দ্র হল টম ক্যান্টি।

কিন্তু টম ক্যান্টির মনে আনন্দ নেই। বিবেকের দংশনে সে জ্বলে পুড়ে মরছে। এতদিন যে বিবেককে সযত্নে সে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, সে আর ঘুমিয়ে থাকতে রাজী নয়, মাথা তুলে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ভৎর্সনা করছে টমকে—"এ তুমি কী করছ। এই কি মানুষের কাজ? নরকেও যে তোমার স্থান হবে না।"

টম রাজা হতে চলেছে, না ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে যাচ্ছে? একখানা মুখের ছবি সে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারছে না কিছুতেই। উদার করুণ এক কিশোর রাজপুত্রের কমনীয় মুখচ্ছবি! সেই রাজপুত্র তাকে অপরিসীম দয়া দেখিয়েছিলেন, প্রতিদানে টম তাঁর মুকুট, তাঁর সিংহাসন, তাঁর নাম পর্যন্ত অপহরণ করতে যাচ্ছে। এই কি মানুষের মত কাজ?

টম দাঁড়িয়ে আছে রাজবেশ পরে। ক্যাণ্টারবেরির আর্কবিশপ ইংলণ্ডের রাজমুকুট হাতে করে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মুকুট টমের মাথার ঠিক ওপরে উঁচু করে ধরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন তিনি। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। এই মন্ত্রপাঠ শেষ হলেই রাজমুকুট টমের মাথায় শোভা পাবে। লর্ড ও লর্ডপত্নীরা নিজের নিজের মুকুট হাতে করে রয়েছেন, রাজা মুকুট পরিধান করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরাও রিক্ত শির মুকুটে ভূষিত করবেন। তাই প্রথা।

মন্ত্রপাঠ শেষ। মুকুট সমেত আর্কবিশপের হাত টমের মাথার দিকে নেমে আসছে, এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল ওয়েস্ট মিনস্টার গির্জার গভীর স্তব্ধতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে—

"সাবধান? ও মস্তকের জন্য রাজমুকুট নয়। রাজা আমি। সাবধান আর্কবিশপ!"

গির্জার মাঝামাঝি যে লম্বা পথ বেদীর নীচে থেকে বরাবর পশ্চাদ্বার পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেই পথ বেয়ে দ্রুতপদে চলে আসছে এক ছিন্নবেশ রুক্ষকেশ কিশোর। তারই মুখ থেকে বার বার নির্গত হচ্ছে ওই কঠোর সতর্কবাণী—"সাবধান! ও মস্তকের জন্য রাজ-মুকুট নয়। রাজা আমি।"

সবাই চকিত, চমকিত, হতবুদ্ধি। প্রহরীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল এই দুঃসাহসী বালককে ধৃত করবার জন্য। কিন্তু সবাইকে আরও হতচকিত করে দিয়ে এবারে ধ্বনিত হয়ে উঠল টম ক্যান্টির কণ্ঠস্বর—"সাবধান! কেউ ও'র অঙ্গস্পর্শ কোরো না। সত্য সত্য উনিই রাজা!"

বেত্রাহত কুকুরের মত প্রহরীরা পিছিয়ে গেল। চীরবসন রাজা এডোয়ার্ড ততক্ষণে বেদীর কাছে এসে পড়েছেন, উঠে এসেছেন বেদীর ওপরে। আর রাজবেশধারী টম জানু পেতে বসেছে তাঁর সম্মুখে। বলছে "মহারাজ! আপনার দীন ভৃত্য টম ক্যান্টিই সর্বপ্রথম আপনাকে রাজভক্তি নিবেদন করছে। আপনার রাজবেশ আপনি গ্রহণ করুন, আমায় মুক্তি দিন এ সংকট থেকে!"

এগিয়ে এলেন রাজ-অভিভাবক ডিউক অব্ সমারসেট। উচ্চকণ্ঠে সবাইকে বললেন—"মহারাজের মস্তিষ্কবিকৃতি আবার দেখা দিয়েছে। কেউ ওকথায় কোন গুরুত্ব আরোপ করবেন না!"

তারপর নবাগত চীরধারী বালকের উপর রক্তচক্ষু নিবদ্ধ করে কী একটা কড়া শাসানি তিনি উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ সে রক্তচক্ষু কোমল হয়ে এল, ক্রোধের পরিবর্তে তাতে ফুটে উঠল গভীর বিস্ময়। একবার নবাগতের দিকে, একবার টমের দিকে তিনি হতবুদ্ধির মত তাকাতে লাগলেন। কী আশ্চর্য! এমন সাদৃশ্য কি দুজন লোকের মধ্যে থাকতে পারে?

একা সমারসেট নন, উপস্থিত সকলেরই এক অবস্থা। সে সাদৃশ্য এত প্রবল যে প্রথম দৃষ্টিতেই তা ধরা পড়ে যায়। সকলেই তা লক্ষ্য করেছে, এবং সকলেই হয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

সমারসেটই প্রথম সেই হতবুদ্ধি অবস্থা কাটিয়ে উঠলেন। তিনি রাজ-অভিভাবক। রাজার এবং রাজ্যের ভাল যাতে হয়, তা দেখবার দায়িত্ব তাঁর। একই চেহারার দুই বালক, দুইজনই বলছে—"আমি এডোয়ার্ড, ইংলণ্ডের রাজা", এ রকম অবস্থা ঘটলে রাজ্যের শক্তিমান অভিজাতদের ভেতরে অতি সহজেই দুটো দল সৃষ্টি হতে পারে, বেধে যেতে পারে গৃহযুদ্ধ। সে অশুভ সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার দায়িত্ব সমারসেটেরই। তিনি প্রহরীদের অধিনায়ককে আদেশ করলেন—"সার টমাস, এই ভিখারী বালককে বন্দী করে এক্ষুনি টাওয়ারে নিয়ে যান।"

"কক্ষনো না!"—বলে উঠল টম ক্যান্টি দৃঢ়স্বরে, উচ্চকণ্ঠে—"আমি বলছি উনিই রাজা এডোয়ার্ড। ওঁর অঙ্গ স্পর্শ করবার দুঃসাহস যার হবে, সে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে!"

সমারসেট চিন্তায় পড়লেন—তারপর, চিন্তা করে করে একটা পথ দেখতে পেলেন যেন, দরিদ্র বালককে সম্বোধন করে বললেন—"আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। তার সঠিক উত্তর করতে পারলেই বুঝব আপনি রাজা।"

"করুন জিজ্ঞাসা।"—নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন রাজা।

তখন চলল বহু প্রশ্নোত্তর। রাজা অতি অনায়াসে রাজপুরীর বিভিন্ন মহলের বর্ণনা করে গেলেন, রাজকন্যাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, বললেন মৃত পিতার কথাও কিছু কিছু। সমারসেট বিস্মিত, সমাগত অভিজাতেরা নির্বাক, গ্যালারির জনতা কৌতূহলী।

"সব কথাই ঠিক ঠিক মিলেছে বটে, কিন্তু এসব কোন প্রমাণ নয়।"—বললেন সমারসেট। টমের দিকে আঙুল নির্দেশ করে

বললেন—“মহারাজও এসব কথা জানেন এবং এমনি অনায়াসেই বলতে পারেন। এতে কিছু প্রমাণ হল না।”

বিরক্তভাবে এডোয়ার্ড বলেন—“কিসে প্রমাণ হবে, তাই বলুন।”

সমারসেট ভাবছিলেন। ভেবে ভেবে উপায় স্থির করেও ফেলেছেন। বললেন—“মহারাজ অষ্টম হেনরি রাজকীয় সীলমোহরটি যুবরাজের অর্থাৎ বর্তমান মহারাজের হাতে দিয়েছিলেন নিরাপদে রাখবার জন্য। ব্যাধির জন্য বর্তমান মহারাজ এযাবৎ স্মরণ করতে পারেন নি যে কোথায় তিনি রেখেছেন সেটা। আপনি যদি বলতে পারেন সে সীলমোহর কোথায়, তাহলেই প্রমাণ হবে যে আপনিই সেই যুবরাজ—বর্তমানে আপনিই রাজপদের অধিকারী।”

সমারসেটের বক্তব্য শুনেই এডোয়ার্ড বেদীর ওপরে দণ্ডায়মান বহু অমাত্যের ভেতর থেকে একজনকে ইঙ্গিতে ডেকে বললেন—“লর্ড সেণ্টজন, আপনি এক্ষুনি আমার মহলে চলে যান। আমার ক্যাবিনেটের দরজা থেকে অন্যদিকের কোণে দেওয়ালের গায়ে একটি লৌহবর্ম টাঙানো আছে, দেখবেন! তারই বাহুত্রাণ অংশটার খোলের ভেতর লুকানো আছে রাজকীয় সীলমোহর! নিয়ে আসুন গিয়ে।”

সেণ্টজন এই ভিখারী বালকের আদেশে প্রাসাদে ছুটে যেতে ইতস্ততঃ করছেন দেখে টম ক্যান্টি মঞ্চের ওপর পদাঘাত করে কঠোর স্বরে বলে উঠল—“আপনি যাচ্ছেন না কেন? রাজার আদেশ শুনতে পান নি?”

এই কঠোর আদেশে রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন সেণ্টজন। কে যে রাজা, কে যে নয়, বেচারা লর্ড তা বুঝবেন কেমন করে? উভয় রাজার মাঝ বরাবর একটা অভিবাদন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন, এবং মিনিট দশকের ভেতরেই ছুটে ফিরে এলেন আবার, সোনার সীলমোহরটা মাথার ওপরে উঁচিয়ে ধরে।

আর সন্দেহ নেই। এই সীলমোহরের কথা টম ক্যান্টিকে বহুবারই

জিজ্ঞাসা করেছেন হার্টফোর্ড। এবং প্রতিবারই টম জিজ্ঞাসা করেছে—"সীলমোহর বস্তুটা কি? দেখতে কী রকম?" এ প্রশ্নের আর উত্তর পায়নি টম। হার্টফোর্ড ভেবেছেন, যুবরাজ যখন জিনিসটার চেহারাই মনে করতে পারছেন না, তখন তা কোথায় আছে তা কি আর বলতে পারবেন?

আজ জিনিসটাকে চাক্ষুষ দেখে টম চেঁচিয়ে উঠল—"এই? এরই নাম সীলমোহর? এটা দেখতে কী রকম একবার যদি কেউ তা বলত আমায়, বহু আগেই আমি এটা বার করে দিতে পারতাম। রাজপুত্র এটা যখন বর্মের ভেতর লুকিয়ে রাখেন, আমি তো দেখেছিলাম। কত সময় এ দিয়ে কত কাজও আমি করেছি!"

"কী কাজ করেছ?"—জিজ্ঞাসা করেন রাজা।

লজ্জায় মাথা নীচু করে টম। উত্তর দেয় না। অবশেষে রাজার বার বার তাগিদে বাধ্য হয়ে বলে—"বাদাম ভেঙে খেতাম ও দিয়ে।"

সে কী প্রবল অট্টহাসি গির্জায়, এই কথা শুনে! টম যে রাজপুত্র হয়ে জন্মায় নি, এটা এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার।

সমারসেটের মনে হঠাৎ দেখা দিল ক্রোধ। এতদিন তাহলে একটা ছোটলোকের ছেলের তাঁবেদারি করতে হয়েছে তাঁকে! এ ব্যাপারে টমের যে কোন দোষই ছিল না, সে যে চিরদিনই বলে আসছে যে সে গরিবের ছেলে, তার সেসব সত্য উক্তিকে পাগলের পাগলামি বলেই যে সমারসেট এবং অন্য সবাই উড়িয়ে দিয়েছেন এতদিন, এসব কথা ভুলে গেলেন সমারসেট। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে হুকুম দিলেন—"সার টমাস, এই ভুঁইফোঁড় ছোকরাকে নিয়ে টাওয়ারে বন্দী করুন।"

এবারে বাধা দিলেন রাজা এডোয়ার্ড। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"তা হতে পারে না। ওর তো কোন দোষ আমি দেখতে পাই না! রাজ-অমাত্যেরা যদি অন্ধ হন, সে কি ওর দোষ? না, ওর দেহ কেউ স্পর্শ কোরো না। ওকে আমি আদর করে আমার

সহচর করে রাখব, সে সম্বন্ধে আমার আদেশ পরে জানবেন আপনারা। এখন অভিষেক সুসম্পন্ন হোক।”

তখন টমের দেহ থেকে রাজপরিচ্ছদ খুলে নিয়ে এডোয়ার্ডের ভিখারীসজ্জার ওপরে তাই যথাযথ পরিয়ে দেওয়া হল। ছিন্ন বসন কোথায় ঢাকা পড়ে রইল স্বর্ণখচিত সাটিন ভেলভেটের নীচে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি আবার সবই নতুন করে করতে হল। তারপর আর্কবিশপ ইংলণ্ডের রাজমুকুট স্থাপন করলেন রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের মস্তকে। সমবেত লর্ড ও লেডিরাও নিজের নিজের মুকুট মাথায় পরলেন সেই একই মুহূর্তে।

* * *

এতক্ষণ মাইলস্ হেণ্ডন কোথায়?

রাজার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরেই সে পাগলের মত ছুটে বেড়াতে লাগল। প্রথমে লণ্ডন ব্রিজের ওপরে, তার পরে নগরের পথে পথে। সারা রাত কাটল আঁস্তাকুড় বস্তির গলিতে গলিতে। কারণ জন ক্যান্টির মুখ থেকে মাইলস্ এইটুকু শুনেছিল যে ওই বস্তিতেই তার বাড়ি। এবং যদি জন ক্যান্টির দাবিই সত্য হয়, যদি তার আশ্রিত পাগল ছেলেটা নিজের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সত্যি সত্যিই জন ক্যান্টিরই ছেলে হয়, তাহলে লণ্ডনে ফেরার পর রাজার তো আঁস্তাকুড় বস্তির দিকেই যাওয়া স্বাভাবিক! মাইলস্ সেইদিকেই খুঁজল সারা রাত।

রাত্রি যখন প্রভাত হল, তখনও সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তবে বস্তি অঞ্চলে আর নয়; সে টেমস্ নদীর তীর ধরে ধরে চলে এসেছে স্ট্র্যাণ্ডের দিকে। এখানে রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ি—নিজস্ব হাতার ভেতর হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন বাড়িতেই লোকজন তেমন নেই, সবাই গিয়েছে অভিষেক দেখতে ওয়েস্টমিনস্টার গির্জার অভিমুখে।

মাইলস আর পারে না। কাল রাত্রে ভিড়ের ভেতর তার

টাকার থলেটি তুলে নিয়েছে পকেটমারেরা! একটি পেনিও কোন পকেটে পড়ে নাই। কাজেই খাওয়া জোটেনি কাল রাত থেকে আজ তুপুর পর্যন্ত। কারও কাছে খাদ্য প্রার্থনা করা? এমন চিন্তাই মাথায় ঢোকে নি মাইলসের।

অনাহারে পথপর্যটনে একান্ত অবসন্ন হয়ে অপরাহ্ন বেলায় মাইলস্ শুয়ে পড়ল টেমসের তীরে এক গাছতলায়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, চেতনা হারিয়ে ফেলবার পূর্ব মুহূর্তে সে শুনতে পেল —কোন্ এক পথচর তার সঙ্গীকে বলছে—"হয়ে গেল তাহলে নতুন রাজার অভিষেক। আচ্ছা মজা দেখা গেল।"

আর কোন কথা কানে ঢুকল না। ঘুমিয়ে পড়ল মাইলস্! জাগল পরের দিন তুপুর নাগাদ। সর্বাঙ্গে ব্যথা, পেটে আগুন জ্বলছে, পকেট খালি। উঠে গিয়ে নদীতে মুখ ধুয়ে সে কয়েক আঁজলা জল খেল ঢকঢক করে। তারপরে সে চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। পিতৃবন্ধু সার হামফ্রে মার্লোকে যদি দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে তুই এক পাউণ্ড তাঁর কাছে ধার করে ক্ষুধার জ্বালাও থামানো যাবে, তারপর তাঁর কাছে সুপারিশ নিয়ে রাজার কাছে দরখাস্তও করা যাবে হৃত জমিদারি পুনরুদ্ধারের জন্য।

প্রাসাদের কাছে আসতেই এক সুবেশ বালকের সঙ্গে দেখা। এ রাজারই অন্যতম ভৃত্য। রাজা একে এবং অন্য কয়েকজনকে পাঠিয়েছেন—প্রাসাদের আশেপাশে ঘুরে মাইলস্ হেণ্ডন নামক এক ব্যক্তিকে খুঁজবার জন্যে। মাইলসের চেহারার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। কী জানি কেন তাঁর মনে হয়েছিল যে নতুন রাজাকে দেখবার কৌতূহলবশেই হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক, মাইলস্ এদিকটাতে একবার আসবেই।

মাইলস্ নিজের নাম বলতেই বালক তাকে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেল। এক পদস্থ সামরিক কর্মচারী সসম্ভ্রমে তাকে নিয়ে গেলেন রাজদরবারে। ডিউক এবং আর্লেরা ছিন্নবেশ অনসনক্লিষ্ট মাইলস্‌কে

সমাদরে অভিবাদন করলেন সমকক্ষের মত,—এর অর্থ কিছু বোধগম্য হল না ওর।

দরবারে রাজাকে ঘিরে বসে আছেন শ্রেষ্ঠ অমাত্যেরা। তাঁদের দিকেই দৃষ্টি রাজার। মাইলস্ কিন্তু একদৃষ্টিতে রাজাকে দেখছে। এ তো তারই আশ্রিত সেই উন্মাদ বালক! তাহলে কি সে-বালক সত্যিই উন্মাদ নয়? সত্যিই কি ইংলণ্ডের রাজা সে? মাইলসের মাথা যেন কাটা যায় নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে। তার রাজাকে সে বড়মানুষি দেখাতে গিয়েছিল হেণ্ডন হলে নিয়ে গিয়ে। ছিঃ ছিঃ—গর্ব করে বলেছিল, সত্তরখানা ঘর তার বাড়িতে, সাতাশ জন চাকর!

কিন্তু রাজা তার দিকে তাকাচ্ছেন না। রাজকার্যে তিনি ব্যস্ত। কিন্তু এ অবস্থায় দরবারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকাও তো তার পক্ষে কষ্টকর! তার ছেঁড়া কাপড়ের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে সোনালী রূপালী পোশাকপরা অভিজাতেরা। টিপ্পনী কাটছে আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে। এ ব্যাপারের শেষ হওয়া দরকার যে!

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দেয়ালের গায়ে গায়ে কতকগুলি কেদারা সাজানো আছে, অবশ্য তাতে বসে নি কেউ, রাজার সম্মুখে আসন গ্রহণ করবার অধিকার তো ডিউকদেরও নেই!

মাইলস্ চট করে গিয়ে ওরই একখানা কেদারা টেনে নিয়ে এল দরবার-কক্ষের মাঝখানে, আর চেপে বসে পড়ল তার ওপরে। সভাসুদ্ধ লোক আঁতকে উঠল একেবারে। লোকটা কি পাগল? রাজার সম্মুখে বসে পড়ল?

প্রহরীরা ছুটে এল তাকে ধরে কক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তার আর সময় পেল না তারা। গোলমাল শুনে রাজা ফিরে তাকিয়েছেন সেইদিকে। দেখেছেন কেদারায় সুখাসীন মাইলস্ হেণ্ডনকে। মনে মনে হেসে তিনি হাত তুলে নিরস্ত করলেন প্রহরীদের, গম্ভীরভাবে বললেন—"ওকে বিরক্ত কোরো না। বসবার অধিকার ওর আছে। সারা ইংলণ্ডে একমাত্র ওরই অধিকার আছে

রাজার সম্মুখে আসন গ্রহণ করবার। আমিই দিয়েছি সে অধিকার।”

তারপর রাজা জ্বলন্ত ভাষায় তাঁর সভাসদগণকে শোনালেন মাইলস্ হেণ্ডনের ভক্তি আর আত্মোৎসর্গের কথা! রাজাকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য সে বেত পর্যন্ত খেয়েছে প্রকাশ্য বাজারের মাঝখানে। এর জন্যে রাজা তাকে উপাধি দিয়েছেন সার মাইলস্ হেণ্ডন, আর্ল অব্ কেন্ট। আর্ল-পদবীর উপযুক্ত জমিদারি ও ভাতা শীঘ্রই তাকে দেওয়া হবে তাও জানালেন রাজা।

যখন হেণ্ডন রাজার সম্মুখে নতজানু হয়ে সাশ্রুনেত্রে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করছেন ঠিক সেই সময়ে দরবারে প্রবেশ করল সস্ত্রীক হিউ হেণ্ডন। তার দিকে চোখ পড়তেই রাজা জ্বলে উঠলেন একেবারে। কোন প্রশ্ন না করে আদেশ দিলেন—“নিয়ে যাও এ নরপশুকে কারাগারে, যথাসময়ে আমি বিচার করব ওর।”

তার পর এল টম ক্যান্টি মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। সে পরিচ্ছদ একটু অসাধারণও বটে, রাজার প্রিয়পাত্রেরা ছাড়া কেউ ওরকম পোশাক পরবার অধিকারী নয়। টম এসে রাজার সম্মুখে নতজানু হতেই রাজা তাকে আদর করে বললেন—“আজ থেকে তুমি রাজবয়স্য। ক্রাইস্টচার্চ হাসপাতালে যে বালকেরা আছে, তাদের সুশিক্ষা দেওয়ার ভার তুমি নাও। যতদিন তুমি বাঁচবে, রাজবয়স্য হিসাবে অভিজাতদের সমান মর্যাদা পাবে তুমি।”

এর পর টম তার মা-বোনদের ফিরে পেল, তাদের ভরণপোষণের ভারও নিলেন রাজা। জন ক্যান্টি কোথায় পালিয়ে গেল, আর তার সন্ধান পেল না কেউ। আর হিউ? মাইলসেরই অনুরোধে তার প্রাণটা বেঁচে গেল, সে নির্বাসিত হল দেশ থেকে। নির্বাসনে অচিরেই মৃত্যু হল তার। এডিথের পুনর্বিবাহ হল মাইলসের সঙ্গে।

রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ড বেশীদিন বাঁচেন নি। কিন্তু অল্পদিনের ভেতরেই ইংলণ্ডের কঠোর দণ্ডবিধির অনেক পরিবর্তন করেছিলেন।

প্রজাদের প্রতি রাজার এই সদয় আচরণ অনেক সময় অমাত্য ও জমিদারদের অসন্তুষ্ট করে তুলত, তারা কখনো কখনো এসে বলত— "এ-আইন-রদ করবার কী দরকার আছে মহারাজ? এর দরুন প্রজাদের তো কোন দুঃখ-দুর্দশা হচ্ছে না!"

এরকম কথা উঠলেই রাজা তাঁর দীর্ঘায়ত করুণ চোখ দুটি বক্তার মুখের ওপর স্থাপন করে আর্দ্রস্বরে বলে উঠতেন—"দুঃখ দুর্দশার তুমি কী জান? সে সব জানে আমার প্রজারা, আর জানি আমি, তাদের রাজা। তোমরা? দুঃখ-দুর্দশা যে কত গভীর হতে পারে, তোমরা তা কোনদিন জানো নি, কোনদিন জানবেও না।"

শেষ